জঙ্গলের জার্নাল

বুদ্ধদেব গুহ

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর : কুশধ্বজ মান্না : মান্না প্রিণ্টার্স
৬৭/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট : কলিকাতা-৬

শ্রীদেবব্রত মৈত্রকে

এই লেখকের অন্যান্য বই :

হলুদ বসন্ত
বাতিঘর
খেলা যখন
প্রথমাদের জন্য
কোয়েলের কাছে
একটু উষ্ণতার জন্যে
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে

ঝো পড়ে এসেছিল। বাঘমুণ্ডার দিক থেকে পুরুনাকোটের দিকে হেঁটে আসছিলাম, জঙ্গলের সুঁড়ি পথ দিয়ে একা একা। শীতের সন্ধ্যের অদৃশ্য হিমেল আঙুল পিছন থেকে ঘাড় ছুঁয়েছিল। দিন ও রাতের মধ্যবর্তী এই একফালি বেওয়ারিশ বেওয়াফা সময়টুকুতে এসে পৌঁছলেই বুকের মধ্যে একটা চাপা কান্না গুমরোতে থাকে।

বেটম নালার পাশেই জঙ্গলের ঠিকাদারের ডেরা। নালার মধ্যে যেখানে জল গভীর, তারই পাশে আকাশ-ছোঁওয়া শাল সেগুন এবং নানারকম জাল-কাঠের জঙ্গলের মধ্যে কতগুলো ঝুপরী। সামনেটায় ঘাস ও আগাছা কেটে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়েছে। চতুর্দিকে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বসে-থাকা হাতীর মতন লম্বা আকারের বিরাট বিরাট কালো পাথর।

ঝুপরীগুলোতে কাবাড়িরা থাকে। ঝুপরীগুলোর বিপরীত দিকে একটা তাঁবু খাটানো। সেই তাঁবুই এখন আমার বাসা।

ডেরা এখনও দূরে আছে।

সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে। গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে ম্লান সোনালি আভার আভাস দেখা যাচ্ছে ওদিকের আকাশে। পুবে ছায়া নেমেছে ভারী হয়ে। ময়ূর ডাকছে থেমে থেমে পথের বাঁ দিক থেকে। নানারকম পাখির সম্মিলিত কাকলীতে কাকলীমুখর হয়ে রয়েছে বন-বনান্তর। ঝিঁঝির স্বর উঠছে শীতের দিনের ঠাণ্ডা নিরন্ধ্র গাছগাছালির মধ্যে থেকে।

এই শীতের বিকেলে এক আশ্চর্য মহিমা বন-জঙ্গলের। বিশেষ করে এরকম গভীর বনে-জঙ্গলে, যেখানে জন্তু-জানোয়ার, পাখ-পাখালি এখনও বেঁচে আছে, যেখানে সভ্যতা নামক অসভ্যতা তার চক্ষুলজ্জাহীন সৌন্দর্য-জ্ঞানহীন কদর্য হাত বাড়ায়নি এখনও।

আর একটু এগোতেই একটা জীপের এঞ্জিনের আওয়াজ পেলাম। জীপ গাড়িগুলো এই পরিবেশে আশ্চর্য মানিয়ে যায়। গাছপালার মধ্যে মধ্যে পাহাড়েপাহাড়ে ধাক্কা-খাওয়া দূরাগত জীপের এঞ্জিনের গোঙানিকে কোনো জানোয়ারেরই আওয়াজ বলে ভুল হয়। জীপটা এদিকের গড়িয়ে-যাওয়া উৎরাই—ওদিকের চড়াই উঠছিল।

যেপথে হাঁটছিলাম তাকে পথ বলে না। গত শীতে ঠিকাদারদের ট্রাক

যাওয়া-আসা করায় পথের দু'পাশে চাকার দাগ হয়ে গিয়েছিল। ঘাস মরে গিয়েছিল। তারপর আবার বর্ষায় ঘাস গজিয়ে উঠেছে তাতে। মধ্যের ফালি-টুকুতে যেখানে চাকা স্পর্শ করে না, সেখানে এক-হাঁটু আগাছা ও ঘাস গজিয়েছে। তাদের এঞ্জিনে এবং ডিফারেন্সিয়ালে ছুঁয়ে সর্‌সর্‌ আওয়াজ করে জীপটা এগিয়ে আসছে।

সামনের বাঁকের মুখে জীপটাকে দেখা গেল। ছাই-রঙা জীপটা এই আসন্ন অন্ধকারের ছায়াচ্ছন্ন পটভূমিতে পুরোপুরি ক্যামোফ্লেজড্‌ হয়ে গিয়েছিল।

পাইকারা জীপ চালাচ্ছিল। টিউলি পাশে বসেছিল।

আমাকে দেখেই জীপটা দাঁড়িয়ে গেল।

খালি গায়ের উপর গামছা-জড়ানো মালকোঁচা-মেরে ধুতি-পরা টিউলি লাফ দিয়ে নেমে আমার দিকে দৌড়ে এল।

দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল, বাবু, বড্ড বাঘটা।

—বাঘ? কোথায় রে?

তারপর আর কথা না বলে ওর সঙ্গে দৌড়ে গেলাম জীপের দিকে।

ইতিমধ্যে আগাছা ভেঙ্গে, ঘাস দলে পাইকারা জীপটার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। আমি সামনের সীটে বসলাম। টিউলি লাফ দিয়ে পিছনে উঠতে না উঠতেই পাইকারা এ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল। গীয়ারেই ছিল গাড়ি—দ্রুতবেগে চড়াইটা নামতে লাগল জীপ।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল ওদের। ওরা সকলে, সব কাবাড়িরা ভিড় করে ডেরার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল—একই জায়গায়। পুরুনাকোটের দিকে মুখ করে।

আমরা গিয়ে পৌঁছতেই ওরা সমস্বরে কথা বলতে লাগল। একটা বড় বাঘ এতক্ষণ পথের মাঝখানে বসেছিল। অতবড় বাঘ নাকি তারা কেউ জন্মে দেখেনি। ওরা বলল, বাঘটা পোড়ো ধরবার জন্য এসেছিল।

ওড়িয়াতে মোষকে পোড়ো বলে। গভীর জঙ্গলে কাঠ কেটে জঙ্গল থেকে মোষ দিয়ে কাঠ টানিয়ে আনতে হয়। মোষরা কাঠ টেনে এনে সুবিধেমত এমন জায়গায় রাখে, যেখান থেকে কাঠ লোড করা সোজা। ট্রাকগুলো জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় যেখানে যেখানে কাজ হচ্ছে, সেখান সেখান থেকে কাঠ লোড করে চলে যায় কটকে বা অঙুলে। কাঠ নামিয়ে রেখে আবার ফিরে আসে।

ওদের কথা কিন্তু আমার বিশ্বাস হলো না। মোষ ধরার হলে ডেরার এ-পাশে ও-পাশে ছড়িয়ে রাখা মোষগুলোর যে-কোনো একটাকে সে বাঘ বিনা আড়ম্বরে ধরতে পারত।

এখন নভেম্বর মাস। বাঘ ও বাঘিনীর মিলন কাল। যে এসেছিল সে বাঘ

কি বাঘিনী যাই-ই হোক, তার আজ অভিসার আছে। নইলে বিকেল বিকেল ঘুম থেকে উঠে ডেরার সামনের পথের মসৃণ ধুলো মেখে সে নিজেকে সাজাত না।

সে-কথা ওদের বলতেই ওরা হাসাহাসি করল। কিন্তু বিলক্ষণ বুঝলাম যে, ওরা একটু ভয় পেয়েছে।

ওরা জঙ্গলের লোক। বাঘ কাকে বলে জানে। চিড়িয়াখানার খাঁচার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে শালীর কাছে বীরত্ব দেখাবার জন্যে খাঁচার মধ্যের বাঘকে ওরা ঢিল ছুঁড়ে মারেনি কখনও। স্বাভাবিক কারণে, বাঘের রাজত্বে জন্মাবধি বাস করে, বড় বাঘের ক্ষমতার পরিচয় জেনে, ওরা বাঘকে ভয় করে; সমীহ করে। ওদের ডেরার আশেপাশে বড় বাঘের অস্তিত্ব খুব প্রাঞ্জল কারণেই ওদের ভীত করে।

গভীর রাতে বাইরে যখন টুপ্‌টুপিয়ে শিশির পড়ে, নালা দিয়ে বরফের মতন ঠান্ডা জল বয়ে যায়, দূরের জঙ্গল থেকে যখন কোট্‌রা হরিণ ব্বাক্‌, ব্বাক্‌, ব্বাক্‌ আওয়াজ করে বাঘের চলাফেরার খবর দেয়, তখন ওরা পাতার ঝুপরীর মধ্যে নড়েচড়ে শোয়—একে অন্যের বুকের কাছে কুন্ডলী পাকিয়ে থাকে। বাইরে মোটা মোটা জাল-কাঠের আগুন জ্বলে। পিছনের জঙ্গল থেকে টুপ্‌-টাপ করে মাকাল ফল ঝরে পড়ে। তাতেই মনে হয় বোমা ফাটল। এমনই আশ্চর্য নিস্তব্ধতা রাতের জঙ্গলে।

হনুমানের দল মাঝরাতে হুপ্‌ হুপ্‌ হুপ্‌ হুপ করে কী জানি কি দেখে চিৎকার করে ওঠে। শাখা-প্রশাখায় জড়াজড়ি-করা কুমারী জঙ্গলের মহীরুহদের এ-ডালে ও-ডালে ঝাঁপাঝাঁপি আর পাতা ঝাঁকাঝাঁকি করে ওরা জঙ্গলের শান্তি বিঘ্নিত করে।

একটু পরে সব আবার চুপ হয়ে যায়।

নালার একটানা কুলকুলানি কানে আসে। ঝিঁঝিরা এক সুরে, এক লয়ে অর্কেস্ট্রা বাজায়। আগুনে কাঠ পোড়ে, কোনো হতভাগিনী বুড়ির বিলাপের মতন—অনির্দিষ্টকাল ধরে—কাউকে শোনাবার প্রত্যাশা না করে—।

ফুট-ফাট শব্দ হয়—আগুনের মধ্যে থেকে তারাবাজির মতন ফুল্‌কি উঠে, লাল জোনাকির মতন জ্বলতে-নিভতে নিভতে-জ্বলতে আকাশের দিকে মিলিয়ে যায়। নালার মধ্যে সাঁতরে-যাওয়া একটা পাহাড়ি মাছ তার মনের দুর্বোধ্য আনন্দে হঠাৎ জলে ডিগবাজি খায়। পকাৎ করে একটা আওয়াজ হয় জলে। জল ছিটকে ওঠে। ছিটকে উঠে শিশির-ভেজা পাথরগুলোকে আরও একটু ভিজিয়ে দেয়।

পাইকারা, টিউলি, গগন, কালিয়া এবং দুর্গা ওদের ঝুপরীর মধ্যে শুয়ে শুয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ভাবে, এবার ঘুমোবে।

টিউলির ওর নতুন-বিয়ে করা বউ লাবণীর কথা মনে পড়ে। তার সুডৌল বুক, তার দু' ঊরুর মাঝের চিকণ কালো নরম কাঠবিড়ালীর উষ্ণতা। এই শীতের রাতে, লাবণীর নগ্ন শরীরের কথা ভেবে, মনে করে, আধো-ঘুম আধো-জাগরণে কল্পনার লাবণীর শরীর নেড়চেড়ে যে-উষ্ণতা যে-আশ্বাস ও পায়, এই ঝুপরীর মধ্যের আগুন এই প্রচন্ড শীতার্ত রাতে তাকে কখনই তা দিতে পারে না। সেই উষ্ণতার স্বপ্নিল আবেশে সে চোখ বোঁজে।

গগন আর পাইকারা ছেলেমানুষ। ওদের দুজনেরই বাড়ি ফুলবানী। পরের বছর ওদের দুজনেরই বিয়ে হবে। গগন সাইকেল পাবে একটা বিয়েতে। পাইকারা একটা হাত-ঘড়ি। আপাততঃ সাইকেল এবং ঘড়ির আনন্দেই ওরা বুঁদ হয়ে থাকে। নতুন বৌয়ের সম্বন্ধে ওদের এখনও কোনো ঔৎসুক্য জাগেনি। খড়কুটো মুখে করে ওড়াওড়ি করা ছোট ছোট পাখির মতন, ওরা ঘোরের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে, ঘর বাঁধার কথা ভাবে।

দুর্গার বয়স হয়েছে। পম্পাশর থেকে যে-রাস্তাটা লবঙ্গী চলে গেছে ঘন গভীর দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, সে-রাস্তায় তার গ্রাম। সেখানে তার বৌ থাকে; তার ছেলেমেয়েরা। তার ভাই থাকে, যে ক্ষেত-খামার দেখাশোনা করে। এবারে যখন বাড়ি ছেড়ে আসে, তখন ও কন্দমূল লাগিয়ে এসেছিল ক্ষেতে। শুয়োর, শজারু আর হরিণের উপদ্রবে কন্দমূল বাঁচাতে পারবে কিনা জানে না। ওর ছোট ছেলেমেয়েরা সারাদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি কন্দমূলের ক্ষেতে মূল পাহারা দেয়। সূর্যাস্তর পর ওর ভাই গিয়ে ঝুপরীর মধ্যে হাঁড়িতে কাঠ-কয়লার আগুন করে রাত জাগে। মাঝে মাঝে ক্যানেস্তারা পেটে। কখনও কখনও বা এক বোতল পানমৌরী গিলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অশ্লীল গান গায়। শুয়োর তাড়ায়, শজারু তাড়ায়, নিজের বুকের মধ্যের ভূত-পেত্নীর ভয় তাড়ায়। আধ-পেটা খেয়ে থাকার দুঃখ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করে মন থেকে; মাটি থেকে কন্দমূল ওপড়ানোর মতন।

দুর্গা স্বপ্ন দেখে, ওর ক্ষেত লাল লাল কন্দমূলে ভরে গেছে। আর কিছু-দিন পরেই নভেম্বরের মাঝামাঝি অষ্টমী পূজা। দুর্গা বাড়ি যাবে। ওর বৌ নরম নরম গোল গোল এন্ডুলি পিঠা বানাবে। গুড় দিয়ে এন্ডুলি পিঠা খাবে দুর্গা। আরও খাবে অন্যরকমের এন্ডুলি পিঠা—যে-পিঠা বহুদিন খাওয়া হয়নি তার।

ওরা বললে, বাঘটা সোজা রাস্তায় এগিয়ে গিয়েছিল, তারপর বোষ্টম

নালাটা যেখানে পথটাকে কেটে গেছে, যেখানে একটা কজওয়ে আছে নালার ওপর, তারও আগে গিয়ে বাঁদিকের জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছিল।

ততক্ষণে অন্ধকারও হয়ে গেছে।

সব ক'টা ঝুপরীর সামনে আগুনের উপর কালো কালো মাটির হাঁড়িতে ভাত চাপিয়েছে ওরা। এক-একটা ঝুপরীর এক-একটা হাঁড়ি। জঙ্গলে তরি-তরকারি পাওয়া যায় না। ডালও একটা বিলাসিতা। মাটির হাঁড়িতে টগবগ করে ভাত ফুটছে—ভাতের মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে। জায়গাটা ঘামের ভাত, মেহনতের ভাত, মিষ্টি ভাতের গন্ধে ভরে আছে।

ওরা কেউ কেউ বা ভাতের মধ্যে একটু আফিং-এর গুঁড়ো ঢেলে দিয়েছে। ঘুম ভাল হবে। নেশাও হবে। দিশী-বিদেশী বইয়ে যে-সব ক্যালরীর হিসাব থাকে—সে-সবের খবর রাখে না ওরা। ওরা শুধু ভাত খেতে পেলেই নিজেদের কৃতার্থ মনে করে। দিনে ও রাতে দু'বেলা। ভোরবেলা একবার আর কাজ সেরে এসে সন্ধ্যেবেলায় একবার। ওরা এই খেয়েই সারাদিন কাজ করে। টাঙ্গী কাঁধে জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে রাইফেল হাতেও আমাদের মতন শহুরে শৌখিন শিকারীদের ঢুকতে গা ছম্ ছম্ করে, সেখানেই ওরা সারা দিন সারা রাত কাটায়।

আফিং-ই ওদের জান্। আফিং-ই ওদের বেশিরভাগকে পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখে। ওদের মুখগুলো ফ্যাকাশে, জোলো-জোলো ফোলা-ফোলা রক্তশূন্য হয়ে যায়। যৌবনে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। তখন রক্তের তেজ থাকে। কিন্তু ওদের মধ্যে বেশিরভাগ কাবাড়িরই যৌবনের পরেই বার্ধক্য।

ওরা অনেক গান গায়, অনেক কাঠ কাটে, পান-মৌরী খেয়ে অনেক হাসে, তারপর একদিন হাসতে হাসতে, নিজেকে, নিজের জীবনকে, নিজের অস্তিত্বকে পরিহাস করতে করতে কখন যে একটা প্রচন্ড পরিহাসের মতন বাঁশের চাটাইয়ে মোড়া অবস্থায় মাছি ভন্-ভন্ শব হয়ে নদী-নালার পাড়ে কি পাহাড় চূড়ায় ছাই হওয়ার জন্যে চলে যায় ওরা, তা নিজেরাই জানে না। ওরা যেখানে পুড়ে ছাই হয়, সেখানে জমি বড় উর্বরা। ভারী সুন্দর লাল থোকা থোকা না-নউরিয়া ফুল ফোটে তার চারপাশে। ওদের জীবিতাবস্থার হাসি চিরদিন সেই ফুলগুলোতে লেগে থাকে।

নকুল আমাকে চা বানিয়ে দিয়েছিল। পর পর দু'কাপ চা খেয়ে, আমি আগুনের পাশে কাঠের গুঁড়িতে বসলাম ওদের সঙ্গে গল্প করবার জন্যে।

প্রতি রাত্রে এই সন্ধ্যের সময়ের পর থেকে রাত আটটা অবধি আমাদের গল্প হয়। ওরা অর্গলমুক্ত মনে ওদের কথা বলে। ওদের ঘরের কথা, ওদের

ভবিষ্যতের কথা, ওদের অতীতের কথা। কত কী যে জানার আছে ওদের কাছে, তা বলার নয়।

বাঘটাকে দেখে ওদের মধ্যে কার কি রি-এ্যাকশান্ হয়েছিল, তা-ই নিয়ে এখন আলোচনা হচ্ছিল; হাসাহাসি হচ্ছিল।

ওরা সকলেই আমার কাছ থেকে পাইপের টোব্যাকো চেয়ে নিয়ে তামাক-পাতার মতন ঠোঁটের নিচে রেখে খেতে ভালোবাসে। রোজ সকাল-সন্ধ্যেতে এই এক রিচুয়ালের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

ওদেরও ভাত হচ্ছিল। আমারও ভাত হচ্ছিল। একটু ডাল ও একটা বুনো মুরগীর ডিম ছেড়ে দিয়েছিল নকুল ভাতে। ভাতের গন্ধের মধ্যে বসে আমরা গল্প করছিলাম।

এমন সময় ট্রাকের আওয়াজ পাওয়া গেল। এই ডেরার ম্যানেজার হটবাবু কটক গিয়েছিলেন মালিকদের হিসাব-নিকাশ দিতে।

ট্রাকটা এসে দাঁড়াল ডেরার সামনে। ডেরা অবধি ট্রাক আসার মতন পথ আছে। কিন্তু তারপর আর ট্রাক যাবার রাস্তা নেই।

ট্রাকের যুবক ড্রাইভার ও ক্লিনার লাফাতে লাফাতে এল। পেছনে পেছনে ধীর পায়ে বৃদ্ধ হটবাবু।

হটবাবু বললেন, ডেরা থেকে আধমাইল দূরে একটা বিরাট বাঘের সঙ্গে ওঁদের দেখা হয়েছে। বাঘটা রাস্তা ধরে, রাস্তার মাঝ বরাবর আমাদের ডেরার দিকেই আসছিল। ট্রাকের আওয়াজ শুনে রাস্তা থেকে জঙ্গলে নেমে গেছে।

বাঘের পুনরাগমনের কথা শুনে সকলকেই একটু চিন্তিত দেখাল। হটবাবু বেশ উদ্বিগ্ন হলেন, যখন শুনলেন যে ডেরার সামনেই বড় বাঘকে দেখা গেছে সন্ধ্যের মুখে।

মোষগুলো ডেরার আশেপাশেই বাঁধা ছিল এদিকে ওদিকে। হটবাবু আমাকে অনুরোধ করলেন রাইফেলটা নিয়ে কালিয়া আর গগনের সঙ্গে একটু যেতে। ওরা মোষগুলোকে এক জায়গায় করে একেবারে ডেরার পাশেই বেঁধে দেবে।

নতুন ট্রাক-ড্রাইভার ছোকরা পাঞ্জাবী মেহেরচাঁদ খুব সাহসী ও উৎসাহী লোক। ও একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে মশালের মত করে আমাকে বলল, চালিয়ে সাহাব।

আমি হটবাবুকে খুশি করার জন্য ওদের সঙ্গে গেলাম।

মিনিট পনেরোর মধ্যে কালিয়া আর গগন পোড়োগুলোকে খুলে এনে ডেরার পাশে বেঁধে রাখল। শেষ পোড়োটা যেখানে বাঁধা ছিল সেখানে

পৌঁছতেই এক কাণ্ড হলো। সেটা প্রায় শ'খানেক গজ দূরে ছিল ডেরা থেকে। পোড়োটা থেকে হাত-তিরিশ দূরে একটা বড় কালো পাথর ছিল। প্রায় একতলা সমান উঁচু। তার ওপরে একটা ঝাঁকড়া কুচিলা (নাক্স-ভমিকা) গাছ। মেহেরচাঁদ যখন জ্বলন্ত কাঠটাকে উঁচু করে ধরেছে, ঠিক তখনই সেই গাছের ছায়ায় পাথরের ওপর একজোড়া চোখ জ্বলতে দেখা গেল। লাল লাল!

দু'টি চোখের দূরত্ব ও চোখের আয়তন দেখে, কালিয়া, গগন এবং আমি তিনজনেই বুঝলাম যে ওটা একটা বড় খাটাশ অথবা ছোট চিতা বাঘ। কোনো কারণে ওখানে চুপ করে ওত পেতে বসে আছে।

কিন্তু মেহেরচাঁদ জঙ্গলে নতুন চাকরি নিয়ে এসেছে। সে শুনেছে, অন্ধকারে বাঘের চোখ জ্বলে এবং একটু আগে পেছন থেকে স্বচক্ষে বাঘ দেখেওছে সে ট্রাকের স্টীয়ারিংয়ে বসে।

কিন্তু দৈত্য-প্রমাণ ডিজেল-মার্সিডিস ট্রাকের স্টীয়ারিংয়ে বসে তার তীব্র হেডলাইটের আলোয় বাঘ দেখা এক, আর পায়ে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত-কাঠের কম্পমান লাল স্তিমিত আগুনে গভীর জঙ্গলের মধ্যে আলো-পড়া জ্বল্-জ্বলে বুক-হিম করা চোখ দেখা আর এক। তাছাড়া মেহেরচাঁদের কল্পনা তখন বাঘে ভর্তি। শুধু তখন কেন? তখন থেকে বেশ কিছুদিন ধরেই সে শ'য়ে শ'য়ে বাঘ দেখবে স্বপ্নে।

বেচারার দোষ নেই। জঙ্গলে প্রথম প্রথম গেলে সকলেরই ওরকম হয়। হওয়াই স্বাভাবিক।

ঐ খাটাশের চোখে আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, মেহেরচাঁদ দু'বার নিচু গলায় 'শের' 'শের' বলে জ্বলন্ত কাঠটা হাতে নিয়েই, আমাদের নিরন্ধ্র অন্ধকারে ফেলে এক দৌড়ে ডেরার দিকে চলে গেল। পেছন ফিরে একবার তাকাল না পর্যন্ত।

গগনটা খিলখিল করে হেসে উঠল।

কালিয়া বলল, ষড়াকু কাণ্ডটা দেখিলে বাবু? আন্ধারে কিচ্ছি দিশি পড়ু নাই, আউ সে নেহটা ধরিকি পলাইলে। অর্থাৎ, শালার কাণ্ডটা দেখলে বাবু? অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, আর সে আগুনটা নিয়ে পালিয়ে গেল!

আমারও মজা লেগেছিল, কিন্তু হাসলাম না, মেহেরচাঁদের অবস্থা ডেরায় ফিরে আরো বেশি শোচনীয় হবে বলে।

পোড়োটাকে নিয়ে আমরা যখন ডেরার সামনে এসে পৌঁছলাম, তখন মনে হলো কোনো মন্ত্রবলে সবাই সেখান থেকে উধাও হয়ে গেছে। সকলেই; একমাত্র দুর্গা ছাড়া।

দুর্গা, মুহুরী। সে এমন অনেক বাঘ এ জীবনে চরিয়ে খেয়েছে। আর সকলেই যে-যার ঝুপরীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে; একমাত্র দুর্গা আগুনের পাশে ওর হলুদ-রঙা লুঙ্গি পরে বসে বসে আগুনটা ফুঁ দিয়ে জোর করছে আর অশ্রাব্য ভাষায় কাবাড়িদের ভয় পাওয়ার জন্যে গালাগালি করছে।

আমরা যেতেই ওরা একে একে বেরিয়ে এল। সবসুদ্ধ জমা-কুড়ি কাবাড়ি।

কালিয়া আর গগনের মুখে মেহেরচাঁদের কথা শুনে সকলে মিলে হাসা-হাসি শুরু করল।

মেহেরচাঁদকে আমি বাঁচাবার চেষ্টা করলাম।

বললাম, প্রথমে আমিও চোখ দুটোকে বাঘের বলেই ভুল করেছিলাম।

কিন্তু তাতে মেহেরচাঁদের হেনস্তা কিছু কমল না।

কাবাড়িরা কিন্তু কখনও এমন করে না। বাঘ কি হাতী দেখলে রাতের বেলা অথবা দিনের বেলা ডেরার কাছাকাছি, ওরা বাঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গলা চড়ায়।

পাইকারা বলল যে, ওরা ভেবেছিল সত্যিই বাঘ, আর যদি আমি গুলি করতাম বাঘকে, তাহলে তারপর অনেক কিছু ঘটতে পারত। সে জন্যে সাবধানতা অবলম্বন করে ঝুপরীর মধ্যে চলে গিয়েছিল। ভেবে দেখলাম, ভালই করেছিল।

হটবাবুকে কোথাওই দেখা গেল না।

দুর্গা বলল, ভাল হয়েছে। সে-বুড়োকে বাঘে নিলে ও-ই এরপর ম্যানেজার হবে। ওর উন্নতির রাস্তাটা নির্বিঘ্ন হয় তাহলে।

দুর্গার কথা শেষ হতে না হতে নালার দিকের অন্ধকার ফুঁড়ে ডানহাতে লুঙ্গি এবং বাঁ হাতে ঢাল (ঘটি) ধরে হটবাবু এসে উপস্থিত হলেন। দুর্গাকে গাল দিয়ে বললেন, তোর কপালে ম্যানেজার হওয়া নেই এত শীগগীরি।

কাবাড়িরা খেলো। আমাদেরও খাওয়া-দাওয়া শেষ হলো।

হটবাবু খেয়ে-দেয়ে লাল লুঙ্গির উপর কালো র‍্যাপার গায়ে দিয়ে কালো বাঁদুরে টুপী মাথায় চড়িয়ে আমার পাশে এসে বসলেন কাঠের উপর। তাঁর গড়গড়াটাও সঙ্গে এল। কটকের সুগন্ধি অম্বুরী তামাকের গন্ধ ছড়াতে লাগল বনময়, তার সঙ্গে ভুড়ুৎ ভুড়ুৎ করে গড়গড়া টানার শব্দ। কাবাড়িরা আগুনের মধ্যে বড় বড় গুঁড়ি এনে ফেলে আগুনটাকে জোরদার করল।

হটবাবু বললেন, ঋজুবাবু, একটা কথা বলি? রাগ করবেন না তো?

বললাম, বলুন না কি কথা?

হটবাবু দ্বিধাগ্রস্থ গলায় বললেন, আমার মনটা ভাল বলছে না। বাঘটাকে

কাবাড়িরা দেখল সন্ধ্যের সময়. তারপর আবার আমরাও দেখলাম। ক্যাম্পের দিকেই আসছিল। একটাও পোড়ো যদি মেরে দেয়, তাহলে বড় আফশোষের কথা হবে। আপনি কি একটু সজাগ থাকবেন রাতে? কিছুক্ষণ যদি রাইফেল নিয়ে আগুনের পাশে বসে থাকেন, তাহলে তো আরো ভাল হয়। এই শীতে আপনার কষ্ট হবে, জানি। কিন্তু আমরা নির্বিঘ্নে ঘুমোতে পারি। বসবেন?

জানতাম যে হটবাবু ও কাবাড়িদের ভয় অমূলক। অন্ততঃ আজ রাতে কোনো ভয় নেই। কারণ যে বাঘ পোড়ো ধরবে, সে জঙ্গলের সড়কে ইভনিং-ওয়াক করে না বারবার।

অবশ্য জাগতে হবে না। পোড়োরা ভীষণ সাবধানী। তাছাড়া ছ'-ছটি পোড়ো একই সঙ্গে বাঁধা আছে। বাঘ ওদের ধারেকাছে এলেই ওদের মধ্যে কেউ না কেউ টের পাবে। ওদের হাব-ভাব দেখেই বোঝা যাবে যে, বাঘ এসেছে।

বাইরে থাকতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না। তাছাড়া এতজন লোকের যখন ইচ্ছা যে, আমি বাইরে থাকি, রাত জাগি, তখন আপত্তি করার মানেও হয় না কোনো। বললাম, বেশ তো! থাকব।

হটবাবু বললেন, পুবের আকাশ ফর্সা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চা করে আপনাকে জাগিয়ে দেবো।

আমি বললাম, আচ্ছা।

হটবাবু একটু পর গড়গড়াসমেত ভিতরে চলে গেলেন।

তামাকের হাল্কা গন্ধ রেখে গেলেন আমার জন্যে।

তাঁবুর ভিতর গিয়ে টুপিটা আর ওভারকোটটা নিয়ে এলাম। রাইফেলটার ব্রীচ খুলে দুটো সফ্‌ট-নোজড্ বুলেট ভরে নিলাম। রাইফেলের সঙ্গে ক্ল্যাম্পে লাগানো ছোট ব্যাটারীর টর্চটা কাজ করছে কিনা দেখে নিলাম। তারপর রাইফেলটাকে কাঠের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে রেখে, গুঁড়িতে পিঠ দিয়ে বসলাম।

আমার দারুণ লাগে। এমনি সব দীর্ঘ একাকী রাত—মড়ির উপরে-বাঁধা মাচায় কিংবা ক্যাম্পের সামনে একা একা। কত কী ভাবা যায়—নিজের মনটাকে, তোমাকে লেখা চিঠির মত, ছিঁড়ে ফেলা যায়—আবার মিলিয়ে মিলিয়ে জোড়া লাগানো যায়। অথবা মুর্শিদাবাদের ধুনুরীরা যেমন করে বালাপোষ বানায়, তেমন করে নিজের মনকে ধুনে ধুনে, মনকে ফিন্‌ফিনে করে পিঁজে-পিঁজে আকাশে ছড়িয়ে দিয়ে আবার সেই টুকরোগুলো নিচে ধরা যায়—তারপর পরতে পরতে খস্‌স্ কিংবা যুঁইয়ের আতর লাগিয়ে, সাজিয়ে গুছিয়ে নেড়ে-চেড়ে চমৎকার সুগন্ধি বালাপোষ করে নিয়ে তা দিয়ে জমিয়ে মুড়ে বসে ভাবতে, ভাবতে ভাবতে, কী চমৎকার, কী চমৎকার—রাতের পর রাত কাটিয়ে

দেওয়া যায়।

এখন কৃষ্ণপক্ষ। চাঁদ উঠবে দেরী করে। যখন এসেছিলাম, মানে যেদিন এসেছিলাম এখানে, সেদিন পূর্ণিমা ছিল। জীপটা পম্পাশর ছেড়ে জগন্নাথ-পুর পেরিয়ে পুরুনাকোটের একবারে কাছাকাছি এসে খারাপ হয়ে যায়। খারাপ মানে, ফুয়েল ইনজেকশান্ পাম্প কাজ করছিল না।

পাইকারা বনেট খুলে এঞ্জিনের ভিতরে মুখ নামিয়ে গাড়ি ঠিক করছিল। আমি পায়চারি করছিলাম ধূলি-ধূসরিত পথে। এ জায়গাটা ফাঁকা ফাঁকা। রাস্তার পাশেই ঝুঁকে পড়েনি জঙ্গল। চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করেনি মাথার উপর।

চতুর্দিক ফুট্‌ফুট্ করছিল জ্যোৎস্নায়। ফুট্‌ফুট্ বলা ঠিক হবে না। বন-পাহাড় শুধু গ্রীষ্মকালের চাঁদের আলোতেই ফুটফুট করে। শীতের চাঁদে বন-পাহাড় সপ্‌সপ্ করে। শিশিরভেজা বন-পাহাড়ে আলো পিছলে যায়। রাত যত গভীর হয়, একটা কুয়াশার মতো হিমের আস্তরণ পড়তে থাকে। তাতে যেন পাহাড় জঙ্গলের রূপ অস্পষ্ট হয় বলেই আরো খুলে যায়।

পথের বাঁ পাশে একটা বিল ছিল। তাতে সাদা ফুল ফুটেছিল শাপলার। অসংখ্য হাজার হাজার। বিলের পাশে কার যেন ছোট্ট কুঁড়ে। একসময় এখানে কেউ থাকতো। এখন খড়ের চাল ভেঙে গেছে, মাটির দেওয়াল ধ্বসে পড়েছে। ভেরেণ্ডার বেড়া লাগিয়েছিল কুঁড়ের মালিক একসময় কুঁড়ের চারপাশে—এখন জঙ্গলে রূপান্তরিত হয়েছে। চাঁদের আলোয় ভেরেন্ডার উজ্জল প গুলো, শাপলার ফুল সব যেন হাসছিল। আমি সেই সাধারণ অথচ অস দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। অনেকক্ষণ।

পথের ডানধারে ধূ ধূ রূপোলী ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখা যায়—ধানক্ষেত—দূ মাঝে মধ্যে রাত জাগার ঘর। সেই ধানক্ষেত শেষ হয়েছে গিয়ে বাঘমুণ্ডা বেঞ্জের মাথা-উঁচু পাহাড়শ্রেণীতে। সেই রাতের দিগন্তবিস্তৃত পাহাড়শ্রেণীকে মেঘ মেঘ দেখাচ্ছিল। এতক্ষণে হাতীর দল নেমেছে বোধহয় ধানক্ষেতে, ধান খেতে। এ অঞ্চলে হাতী খুব বেশী। হাতীর জন্য ধান করাই মুশকিল। এক এক দলে তিন-চারটি থেকে পনেরো-কুড়িটি পর্যন্ত নামে ওরা। ওদের পাহাড়প্রমাণ শরীরগুলো নড়েচড়ে বেড়ায়। চাঁদের আলো পিছলে যায় বড়'বড় সাদা দাঁতে। মাঝে মাঝে হঠাৎ কোনো মাদী হাতী বৃংহণ করে ওঠে। কোনো অসংযমী তরুণ মদ্দা হাতীকে তিরস্কার করে। ওরা ঘোরে-ফেরে। কাছে আসে; দূরে যায়। রাত জাগা ঘর থেকে অসহায় চাষীরা তালপট্‌কা ফাটায়—ক্যানেস্তারা পেটে—মশাল নাড়ে। হাতীরা-দৃক্‌পাতও করে না। ওদের কর্তব্য ধান খাওয়া; যারা রাত জাগে, তাদের কর্তব্য চিৎকার চেঁচামেচি করা।

দু'পক্ষই দু'পক্ষের কর্তব্য সমানে করে যায়।

এক সময় রাত গভীর হয়ে আসে। চাঁদের আলোয় হাতীদের গায়ের ছায়া ধানক্ষেতে পড়ে। ওরা কতগুলো অপসৃয়মান আবছা স্তূপের মতো দূরের পাহাড়শ্রেণীর গভীর ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে যায়। ঘন ছায়ার ছায়াচ্ছন্নতার উপর কতগুলো চলমান তরল ছায়া সুপারইম্‌পোজ্‌ড হয়ে যায়।

ধানক্ষেতের উপর একটা একলা টি-টি পাখি টিটিটির-টি, টিটিটির-টি করে চমকে চমকে ওঠে; চাঁদকে তাড়া করে। তাড়া করে দিগন্ত অবধি চাঁদটাকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

ঝুপরীগুলোর মধ্যে এখন আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

আগুনটাও যেন নিঃশব্দে জ্বলছে। নালা দিয়ে কুলকুলিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে; শিশির পড়ছে। গাছের উপরের পাতাগুলোতে শিশির জমে জমে জল হয়ে নিচের পাতাগুলোয় ঝরছে টুপ্‌ টাপ্‌ শব্দ করে, বৃষ্টির মতো।

গভীর রাতের জঙ্গল থেকে একটা আশ্চর্য রহস্যময় ফিসফিসানি উঠছে।

কুম্ভাটুয়া পাখিটা ডেকে চলেছে। বহু দূর থেকে তার গুব্‌ গুব্‌ গুব্‌ গুব্‌ একটানা ডাক শিশিরভেজা জঙ্গল বেয়ে কানে আসছে। কল্পনার পাখিটাকে দেখতে পাচ্ছি। বড় বাদামী লেজঝোলা পাখিটা কুরুম্‌ অথবা রশি অথবা মিট্‌কুনিয়া গাছের ডালে বসে একটানা ডেকে চলেছে।

কাউকে ডাকছে না। হয়তো ডাকার মতো ওর কেউ নেইও। তবুও এই অন্ধকার জঙ্গলে, এই শীতার্ত সিক্তরাতে ও যে বেঁচে আছে, একা থেকেও স্বাভাবিকভাবে যে বেঁচে আছে, এই জানাটাকেই জানান দিচ্ছে গলা ফুলিয়ে। দিকে দিগন্তরে।

আমিও একা আছি। এই মুহূর্তে। ভুল বললাম। একাই ত' সব মুহূর্তে। এ কুম্ভাটুয়া পাখির মতোই একা। কিন্তু চিৎকার করে জানানোর মতো আমার কোনো কথা নেই। আমার কথা এই ফিসফিসে রাতের মতো আমার বুকের মধ্যেই ফিসফিসানি তোলে। আমি নিজেও সেসব কথা ভালো শুনতে পাই না অনেক সময়। তা-ই বাইরের পৃথিবীকে জানানোর কথাই ওঠে না।

মনে পড়ে যাচ্ছিল, এখানে আসার অল্প ক'দিন আগে একদিন তোমার কাছে গিয়েছিলাম। শেষবার। সেই-ই বোধহয় শেষবার তোমার কাছে যাওয়া এ জীবনে; তেমন করে কিছু চাইতে যাওয়া। শেষবারঃ কারণ আমার জীবন তোমাকে খুঁজতে গিয়ে, তোমাকে পেতে গিয়ে এক কানাগলির মধ্যে হারিয়ে গেছে। যেখানে প্রবেশ পথ ছিল, কিন্তু নির্গমনের পথ ছিল না কোনো।

তোমার সেই দুপুরবেলার চেহারাটা এখনও চোখে আঁকা আছে। আঁক থাকবে যতদিন বাঁচবো আমি; যতদিন মস্তিষ্কের মধ্যে স্মৃতির রস ক্ষর হবে।

তোমার চান হয়ে গিয়েছিল। সাদা খোলের উপর একটা কালো আর লা ডুরে টাঙ্গাইল শাড়ি পরেছিলে তুমি। কালো ব্লাউজ। খোঁপা করেছিলে সুন্দর, হালকা বসন্ত বাতাসে ভেসে আসা করৌঞ্জ ফুলের গন্ধের মতো নর প্রসাধনে সাজিয়েছিলে নিজেকে। ছিপ্‌ছিপে—তোমাকে সাদা আর কালে আর লালে-মেশা একটা মিষ্টি দুষ্টু প্রজাপতির মতো দেখাচ্ছিল।

হাতে একটা কালো চামড়ার ব্যাগ ঝুলিয়ে তুমি বেরিয়ে যাচ্ছিলে।

আমাকে দেখে বলেছিলে, আপনি? অসময়ে?

আমি অবাক হয়েছিলাম। বলেছিলাম, সে কি? আজকে বুধবার না আমি তো আজকেই আসব বলেছিলাম।

তুমি অম্লানবদনে বলেছিলে, আমার মনে ছিল না। আমি একটু রাণুদি বাড়িতে যাব। এক্ষুনি।

আমি দুঃখিত হয়েছিলাম। তোমার কাছে কখনও আসব বললে সাতদি আগে থেকে সে কথা আমার মনে হয়, মনে হয় দেখা হওয়ার কথা, দেখ হওয়ার দিন, ঘণ্টা, মুহূর্ত সব বুকের মধ্যে গাঁথা থাকে। অথচ তুমি কিরকম ক্যাজুয়ালি বলে ফেল, "আমার মনে ছিল না"।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুমি খাটের উপর বসলে তোমার হাঁটু দুটি বুকের কাছে মুড়ে, দু'হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে বসলে।

তোমার কণ্ঠার হাড় দুটি উঁচু হয়ে ছিল। সেই স্নিগ্ধ, ঠাণ্ডা, শান্তির ঘরে, আমার আনন্দনিকেতনে তোমার ফিঙের মতো কালো চোখ দুটি আমার দিকে চেয়েছিল। আস্‌কল পাখির বুকের মতো তোমার কোমল স্পন্দিত বুকের মধ্যের পেলব ভাঁজটি দেখা যাচ্ছিল।

আমি তোমার দিকে, তোমার সমস্ত তুমির দিকে চেয়েছিলাম।

ভাবছিলাম যে, আমি তোমাকে যে তীব্রতায় চেয়েছিলাম, তোমার মনকে, তোমার শরীরকে, সে-চাওয়ার কণামাত্রও তোমাকে কখনও স্পর্শ করেনি। করলে, আমার মতো করে কেউই তা বুঝত না। তা করলে, তোমার শরীর-মন বিদ্যুৎচমকের মতো চমকে উঠত, জ্বলে উঠত। সেই উজ্জ্বল উদ্ভাসিত আলোয় তোমার পর্দা-টানা সায়ান্ধকার ঘর আলোকিত হয়ে উঠত।

তোমার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি ছিল চিরদিনই। কিন্তু সেগুলো আমাকে ঠকানোর, তোমাকে নিজেকে চোখ-ঠারার যুক্তি। আসল কথাটা এই-ই যে,

আমাকে তুমি কখনও আমার জন্যে চাওনি।

আমি সব জানি, সব বুঝি, তবুও কেন তোমার কাছ থেকে সরে আসতে পারি না? আমার মন বদ্ধজলের মতো তোমার মনের উদাসীনতার পানা-পড়া পুকুরে কেন এমনভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে? কেন তোমাকে ভুলে, তোমার মন থেকে উপচে গিয়ে আমার মন অন্য কোনো মনে পেঁছয় না? কেন আমাকে বারে বারে তৃষ্ণার্ত, ক্লান্ত অবস্থায় বারে বারে শুধু তোমারই কাছে গিয়ে সে পিপাসা বহুগুণে বাড়িয়ে আবার ফিরেই আসতে হয়? তুমি আমাকে কষ্ট দিয়ে এত পৈশাচিক আনন্দ পাও কেন? কেন? কেন?

আমি অনেক ভেবেছি। কত নারীই তো তাদের ভালোবাসা জানিয়েছে, জানিয়েছে তাদের নিঃশর্ত অঙ্গীকার। কত বিদুষী; কত সুন্দরী। জানিয়েছে, আমি যাই-ই চাই, যেমন করেই চাই, তারা তা সবই দিতে পারে। শুধু আমাকে সুখী দেখার জন্যে তারা সব কিছু করতে পারে। শুধু আমারই জন্যে।

তবু। তবু কেন? এখনও কেন তোমাকে আমি ঘৃণার মধ্যে, বিস্মরণের মধ্যে, অতীতের অন্ধ আঁধির মধ্যে নিক্ষেপ করে নিজেকে ভারমুক্ত করতে পারি না? কেন তুমি-ব্যতিরেকেও সুখী হতে পারি না, সুখী করতে পারি না নিজেকে? কেন তোমাকে ভুলতে পারি না?

মাঝে মাঝে আমার সেই উর্দু শায়েরীর কথা মনে পড়ে। জীগর মোরাদাবাদীর না মীর্জা গালিবের, ঠিক মনে নেই। মনে আছে শুধু শায়েরীটুকু।

"এতো নহি কি তুম্‌সা জাঁহামে হাসিন্‌ নহি
ইস্‌ দিল্‌কা কেয়া কুরু বহল্‌তা কঁহি নেহি।"

এ তো নয় যে তোমার চেয়ে সুন্দরী পৃথিবীতে আর নেই? কিন্তু কি করি, আমি কি যে করি, আমার এই হৃদয় নিয়ে কি যে করি আমি, এ যে অন্য কোথাও, কোনোখানেই যেতে চায় না। এ যে সরে না; নড়ে না।

তুমি তোমার প্রতি আমার সর্বাঙ্গীণ ভালোবাসার সহজ অধিকারে আমি ছাড়া আর যারা তোমাকে ভালোবাসে, তাদেরও ভালোবাসতে বাধ্য করো আমাকে। তোমাকে যে চায়, যারা চায় তাদের সঙ্গে আমার যোগসূত্র তুমি। শুধু তুমিই। কিন্তু তুমি তাদেরও যদি ভালবাসতে বাধ্য করো আমাকে, তখন বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হয়, মাঝে মাঝে মনে হয়, তোমাকে বলি, দরকার নেই, আর দরকার নেই, তুমি ফিরিয়ে দাও আমার হৃদয়। আমার দ্বারা এ হাটে বিকিকিনি সম্ভব নয়।...

একটা পোড়ো হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলো। তার গলার কাঠের ঘণ্টাটা একটা গম্ভীর শুকনো ডুং ডুং আওয়াজ করলো। অন্য পোড়োগুলো যেগুলো শুয়ে-

বসে ছিল, তারা সকলেই মাথা উঁচু করে, কান খাড়া করে পথের দিকে দেখতে লাগলো।

ওরা নিশ্চয়ই কিছু দেখে থাকবে ওদিকে।

আমি উঠে রাইফেলটা নিয়ে ওদিকে এগিয়ে গেলাম। জানতাম, আর যে জানোয়ারই হোক, বাঘ নয়। বাঘ ধারেকাছে এলে পোড়োদের চেহারাই অন্য রকম হয়ে যেত।

সাবধানে এগিয়ে পথের কাছে পৌঁছতেই এক আশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়লো। যিনি বা যাঁরা এমন দৃশ্য না দেখেছেন, তাঁদের এই দৃশ্যের পদ্যময়তা বোঝাবার মতো ভাষা আমার নেই।

তখন রাত প্রায় একটা। বাঘবমুণ্ডার দিক থেকে ঠিক পথটার সোজাসুজি দূরে জঙ্গলের মাথায় একফালি চাঁদ উঠছে। চতুর্দিক, সমস্ত বিশ্বচরাচর গ্রহ-উপগ্রহ নিস্তব্ধ প্রতীক্ষায় নির্বাক। শীতের গভীর রাতে গহন জঙ্গলের মধ্যে শিশিরভেজা পথে-প্রান্তরে, বনে-পাহাড়ে সেই একফালি প্রোষিতভর্তৃকা চাঁদের যে কী রূপ, তা কি বলব!

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আমি ঐ দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

হঠাৎ সমস্ত মুগ্ধতা কেটে গেল, একটা বুক-কাঁপানো ভৌতিক অট্টহাসিতে।

সে-হাসি বুকের মধ্যে অবধি, বুকের পাঁজরে পাঁজরে চমক তোলে। সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘোরাতেই দেখতে পেলাম একটা প্রকাণ্ড হায়েনা তার কুৎসিত ভঙ্গীতে চলতে চলতে বোষ্টমনালার দিকের জঙ্গলে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সে চলে গেল বটে, কিন্তু তার সেই বুক-কাঁপানো ঘুম-ভাঙানো হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ হাসি অনেকক্ষণ কাঁপতে থাকলো পাতায় পাতায়, ঝোপে-ঝাড়ে পাথরে পাথরে।

অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে কোমর ধরে গিয়েছিল। ভাবলাম, একটু পায়চারি করে নিই পথে, ডেরার সামনেই।

একটা পেঁচা, ছোট্ট পেঁচা; নালার ওপাশে কিঁচর্-কিঁচর্ আওয়াজ করে একটা বড় গাছ থেকে উড়ে ভিতরের সেগুন প্ল্যানটেশনের দিকে চলে গেল।

বসে থাকতে থাকতে আমার নাক কাঠের আগুনের গন্ধে ও মোষের গায়ের গন্ধে ভরে ছিল। এখন ডেরা ছেড়ে ফাঁকায় আসতেই সে গন্ধটা নাক থেকে মুছে গিয়ে রাতের নির্ভেজাল টাটকা গন্ধে নাক ভরে গেল। মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

বাঘের জন্য রাত জাগার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন যে ছিল না তা আমার মতো করে আর কেউই জানতো না। কিন্তু বাঘটা একটা ছুতো। যেমন শিকারও একটা ছুতো। একটা নিছক এ্যালিবাই। শিকারের ছুতো না থাকলে কি এমন-এমন জায়গায় আসতে পেতাম কখনও, বছর বছর, বহু বছর, বারবার? বাঘের ছুতো না থাকলে কি এমন একলা রাতে একা একা এমন পথে পায়চারি করতে পেতাম? "ইয়ে সিরিফ বাহানা হ্যায়।" এক বিহারী মুসলমান বন্ধু বলেছিলেন। ঠিকই বলেছিলেন। আমিও জানি, শিকার সিরিফ বাহানা হ্যায়।

ভীষণ ভালো লাগে জঙ্গলে আসতে; থাকতে। এত ভালো আমার আর কিছুই লাগে না। ভুল বললাম বোধহয়। সবচেয়ে ভালো লাগে তোমার কাছে থাকতে, তোমার সামনে থাকতে। তারপরই জঙ্গল ভালো লাগে।

আমার খুব শখ ছিল, সাধ ছিল, একদিন, কখনও, জীবনে কোনও এক সময়, এক মিনিটের জন্যে হলেও তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকবো।

জঙ্গলে এলে জঙ্গলকে তোমার বিকল্প বলে মনে হয়। বড় শান্তি পাই আমি। আমার সমস্ত শরীর, সমস্ত স্নায়ু, সমস্ত মন স্নিগ্ধ শান্ত হয়ে ওঠে। জঙ্গল থেকে এক আশ্চর্য শান্তি বিকীরিত হয়। সেই শান্তি এমন-এমন রাতে আমার বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়।

যখন যায়, তখন আমার বুক এক পরিতাপহীন, আক্ষেপহীন শান্ত ভাবনায় ভরে ওঠে। ঠিক তখনই তো তোমাকে ক্ষমা করার কথা ভাবি।

তবু, আমি কাউকেই তোমার বিকল্প করিনি, কারণ তোমার কোনো বিকল্প নেই। তোমার বিকল্প হয় না। তোমার কোনো বিকল্প ছিল না। না, না। নয়নার কোনো বিকল্প নেই ঋজু বোসের জীবনে।

এখন রাত প্রায় সোয়া একটা।

তুমি এখন নিশ্চয়ই অঘোরে ঘুমোচ্ছ। কোলকাতায় তো এত শীত নয়। তোমার হালকা নীল রঙা কম্বলটা বুকের নিচু থেকে ঢেকে রেখেছে তোমার শরীর। গলার কাছে নাইটির ফ্রিল দেখা যাচ্ছে। তুমি আরামে ঘুমোচ্ছ।

তুমি যখন ছোট্ট ছিলে, তুমি কী অদ্ভুত এক কায়দায় উপুড় হয়ে শুতে। তোমার পা দুটো গুটিয়ে আনতে বুকের কাছে, পেছনটা উঁচু হয়ে থাকতো, মুখটা গুঁজে দিতে বালিশের গভীরে। তুমি একটা পাগলী ছিলে।

তুমি বলেছিলে যে, একবার আমার সঙ্গে এখানে আসবে। এ জঙ্গলে।

যদি আসতে, তাহলে তোমাকে আমি কত জায়গায় নিয়ে যেতাম। কত জিনিস দেখাতাম। তুমি ভাবতেও পারো না। তুমি সত্যিই জানো না, কলকাতাটা কী দরিদ্র!

আমি জীপের স্টীয়ারিংয়ে বসতাম। তুমি আমার পাশে বসতে। উইন্ড-স্ক্রীনের কাচটা একটু তুলে দিতাম, যাতে হাওয়া ঢুকে পেছন থেকে ধুলো তাড়িয়ে নিয়ে যায়। কোন্ বিখ্যাত কার-রেসিং চ্যাম্পিয়ন বলেছিলেন না? "Give me the moonlight. Give me a girl and leave the rest to me. না। না। যে-কোনো মেয়ে নয়। আমি হলে বলতাম, give me my girl, the girl; and leave the rest to me.

তুমি কটক থেকে আমার সঙ্গে আসতে অংগুলে, ঢেন্‌কানল হয়ে; ঢেন্‌কানলে পোড়-মিঠা খাওয়াতাম। তারপর অংগুলে এসে সম্বলপুরের পথের মোড়ের দোকানে দই-বড়া। অংগুল থেকে রওনা হয়ে আসতাম পুর্ণাগড়। পুর্ণাগড়ের পর করত্‌পটা। করত্‌পটা থেকে পম্পাশর। তারপর জগন্নাথপুর হয়ে পুরুনা-কোটে।

ইচ্ছা করলে তুমি পুরুনাকোটে নাও থাকতে পারতে।

পুরুনাকোটের মোড় থেকে বাঁয়ে চলে যেতাম আমরা—ছোটকুই হয়ে টুল্বকা, অথবা ডাইনে মোড় নিয়ে চলে যেতাম বাঘমুন্ডা। "নগ্ননির্জন" উপন্যাসের পটভূমিকায়।

আসন্ন সন্ধ্যার মুখে যখন বড় বড় ধনেশ পাখিগুলো গ্লাইডিং করে গোলাপি আকাশের আর ঘন জঙ্গলের পটভূমিতে পাহাড়ের কোলে কোলে ফিরে যেত, তখন তুমি যদি চুপ করে বাংলোর বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে থাকতে, তবে তোমার মন এক দারুণ দেনা-পাওনাহীন আনন্দে ভরে উঠতো।

যদি টুল্বকা অথবা বাঘমুন্ডাও না ভালো লাগতো, চলে যেতে আমার সংগে তবে টিকরপাড়ায়। যেখানে মহানদী নীল হয়ে বয়ে চলেছে গভীর খাদের মধ্যে দিয়ে। ওরা বলে সাতকোশীয়া গন্ড। চোদ্দ মাইল চলেছে মহানদী দু'পাশের মাথা উঁচু পাহাড়ের মধ্যের খাদের বুক বয়ে।

নদীর দু'পাশে বোধ রাজ্যের মাথা-উঁচু পাহাড়। বৌধ, ফুলবানী; দশপাল্লা। "পারিধী" উপন্যাসের পটভূমি দেখতে পেতে। তুমি যেখানেই যেতে চাইতে, সেখানেই নিয়ে যেতাম তোমাকে।

তুমি অবাক হয়ে ভালো-লাগায় তাকিয়ে থাকতে; বলতে, ইস্-স্, কী সুন্দর। তুমি ভালো লাগায় শিউরে উঠতে, আর তোমাকে সুখী দেখে আমিও শিউরে উঠতাম। তুমি বলতে, আমার বাহুতে গাল ছুঁইয়ে বলতে, ইস্-স্, কী ভালো!

ডেরা থেকে অনেকদূর চলে এসেছিলাম। এদিকে গাছগুলো ঘন ছায়া ফেলেছে পথে। চাঁদের আলো এখানে পেঁছবে না। ডেরার দিকে ফিরলাম

এবার। অন্ধকারে কোথাও হাতী কি বাইসন, কি ভাল্লুকের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হয়ে যেতে পারে।

ডেরার দিকে ফিরছিলাম, তখন হঠাৎ প্রায় দু'মাইল দূর থেকে এক বাঘিনীর ডাক শোনা গেল। উঁ—আ—ও।

সমস্ত নিশুতি রাত সেই ডাকে গম্‌গম্‌ করে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনি উঠল সে ডাকের। সে ডাক ভিজে বনে পিছলে যেতে লাগল। তারপর ঘনঘন ডাকতে লাগল বাঘিনী। বাঘকে ডাকতে লাগল। এমন চাঁদের রাতে, এমন হিমেল রাতে, বাঘিনী বাঘের আদর খাওয়ার জন্যে পাগলিনী হয়ে উঠেছে যেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্যদিক থেকে, বাঘমুণ্ডার দিক থেকে বাঘের আওয়াজ শোনা গেল। বাঘ উত্তর দিতে দিতে এগিয়ে যেতে লাগল আওয়াজের দিকে। তার আওয়াজে কোনো দ্বিধা, কোনো সংশয় ছিল না। আত্মপ্রত্যয় ঝরে পড়-ছিল তার উদাত্ত ডাকে। বাঘিনীও ডাকতে ডাকতে বাঘের ডাকের দিক আন্দাজ করে এগিয়ে যেতে লাগল।

এখন বাঘিনীদের আদর খাওয়ার সময়।

আস্তে আস্তে ডেরায় ফিরে ভাবলাম, এখন সারা রাত তাঁবুর মধ্যে শুয়ে শুয়ে বাঘ ও বাঘিনীর ডাক শোনা যাবে। সারা রাত ওদের খেলা চলবে। এক দারুণ খেলা। তারপর ভোর হয়ে গেলে ওরা দুজনে দুজনকে ছেড়ে চলে যাবে। ক্লান্তির, ক্লান্তি অপনোদনের; আরামের ঘুম ঘুমাবে ওরা আলাদা আলাদা—। নালার রোদ-পড়া শুকনো বালির ওপরে অথবা গুহায়। চিত হয়ে শুয়ে রোমকূপে রোমকূপে, শরীরের আনাচে-কানাচে, প্রতি অঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গে রোদ লাগাবে। সূর্যের আশীর্বাদে অভিষিক্ত করবে নিজেদের। তারপর আগামী রাতের জন্যে, ঘুমের মধ্যে, সারা দুপুর ঝুরঝুর স্বপ্নের মধ্যে, গোঁফের আড়ালে হাসি হাসি মুখে নিজেরা তৈরী করবে নিজেদের। নিজেদের নরম লোমের শরীরে তাপ সঞ্চিত করে নেবে। নিজে জ্বলবার জন্যে। অন্যকে জ্বালাবার জন্যে।

তাঁবুর মধ্যে ঢুকে, জামাকাপড় খুলে কম্বলের নীচে চলে গেলাম।

এমন অনেক রাতে সত্যিই মনে হয়, একজন সঙ্গিনী, বাঘিনী নয়, নিছক একজন মানবী সঙ্গিনী থাকলেও থাকতে পারতো আমার। আমি তো কুলুঙ্গীর ফুল-বেলপাতা খেয়ে-থাকা দেবতা নই। আমি যে রক্তমাংসের একজন সাধারণ মানুষ।

না, না। বাঘিনী চাইনি আমি, কখনোই না। মানবীই চেয়েছিলাম একজন।

একজন নরম, লাজুক, মিষ্টি মেয়েকে চেয়েছিলাম। একটিমাত্র মেয়ে। তার নাম নয়না।...

ঘুম আসছিল না। রাত প্রায় দুটো বাজে। শীতটা এখন খুব বেশী। বাইরে নালার জল যেন বরফ হয়ে গেছে। কুলকুলানি আওয়াজটা যেন অনেক ঘন হয়ে এসেছে। ক্যাম্প খাটে এপাশ ওপাশ করছিলাম। ওপাশে ফোল্ডিং টেব্‌লে লেখার কাগজ-কলম। জামাকাপড়। বন্দুক ও রাইফেল দুটো এক সারিতে গান-র‍্যাকে সাজানো। বাইরের আগুনের আঁচ এসে তাঁবুর ফাঁক-ফোঁক দিয়ে ব্লুইং করা ব্যারেলগুলোয় পড়ে চক্‌চক্‌ করছে। তাঁবুর ওপরে গাছের পাতা থেকে শিশির পড়ছে টুপ টুপ করে। কুম্ভাটুয়া পাখিটা এখনও ডেকে চলেছে একটানা গুব্‌—গুব্‌—গুব্‌—গুব্‌—গুব্‌—।

ঘুম আসছিল না। অনেক কথা মনে আসছিল—ধানক্ষেতে বগারী পাখির ঝাঁকের মতো। মনে আসছিল, আবার পরমুহূর্তেই দল বেঁধে উধাও হয়ে যাচ্ছিল।

॥ ২ ॥

যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন রোদ উঠে গেছে। তাঁবুর দরজার ফাঁক দিয়ে আলো এসে ঢুকেছে ভিতরে।

নালার ওপাশে একটা ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছে কম করে পাঁচশো পাহাড়ী ময়না একসঙ্গে কিচির-মিচির শুরু করেছে। নেপালী ইঁদুর ডাকছে।

জঙ্গলের অবসরে সবে ঘুম-ভাঙা আলস্যের মধ্যে সকালের এই বিচিত্র ও বিভিন্ন শব্দমঞ্জরী কানে ঝুম্‌ঝুম্‌ করে বাজে। বিশেষ কাজ না থাকলে বিছানা ছেড়ে উঠতেই ইচ্ছা করে না। এই সব মুহূর্তে শুয়ে শুয়ে বারট্রান্ড রাসেলের “ইন প্রেইজ অফ আইডেল্‌নেস” লেখাটার কথা খুব মনে পড়ে। ভদ্রলোক সার বুঝেছিলেন।

তাঁবুর বাইরে এসে দেখি, রোদে চারদিক ঝক্‌ঝক্‌ করছে। বনের মধ্যে সকাল হলে মনেই পড়ে না যে রাত বলে কোনো একটা অস্পষ্ট অনিশ্চয়তায় ভরা ভয়-ভয় ব্যাপার ছিল কয়েক ঘণ্টা আগেই।

বহুদূর অবধি যতদূর চোখ পেঁৗছয়, সব কিছুই আলোতে পরিষ্কার দেখা যায়। দূরের গাছের রোদ-ঝল্‌মল্‌ পাতা। কালো-পাথরে ছিটকে পড়া নালার জলের ক্ষণিক-সাদা, পথের পাশের এ্যালিফ্যাণ্ট গ্রাসের সজীব সবুজ ফালিগুলো এক প্রাঞ্জল নিশ্চয়তায় ভোরের উত্তুরে বাতাসে হেলে দোলে।

তাঁবুর বাইরে তখন কেউই নেই। সব কাবাড়িরা কূপ কাটতে বেরিয়ে গেছে। হটবাবুও নেই। ওরা যেখানে রান্না করেছিল, সেই রান্নার আগুনগুলো এখনও ধিকি ধিকি জ্বলছে।

যখন নকুলের বানানো চা খাচ্ছি বাইরে বসে, নালায় মুখ হাত ধুয়ে নেওয়ার পর, তখন বানিয়া কিষ্ট সাউ তার আশ্চর্য ডালিটি কাঁধে নিয়ে এসে হাজির।

কিষ্ট সাউর কুচকুচে কালো মোটাসোটা, নধর গঠন চেহারা। সব মিলিয়ে বেশ সুখী ভাব। ওর চেহারা দেখে কেউ বিশ্বাস করে না যে, পাহাড়ে-জঙ্গলে মাইলের পর মাইল বাঘ-বাইসন-হাতী ভরা জঙ্গলে অবলীলায় হেঁটে যায় ও এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে বারো মাস।

কিষ্ট সাউই এখানের মোবাইল ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর। দিনের বেলাতে সবসময়েই তার খালি গা। সাজি মাটিতে কাচা, মালকোচা মেরে পরা মোটা ধুতি আর মাথায় সেই চুবড়ি। খুব শীত পড়লে ধুতির কোণটা গায়ে জড়িয়ে নেয় ও পথ চলার সময়। শীত ও গ্রীষ্মে সবসময়েই তার মুখে বানিয়ার হাসি। পৃথিবীর সব বানিয়ার হাসিই বোধহয় একরকম।

কিষ্ট বলল, দন্ডবৎ আইজ্ঞাঁ।

আমি নমস্কার করে ওকে বসতে বললাম। নকুলকে একটু চা বানাতে বললাম ওর জন্যে—সঙ্গে তেল-কাঁচালংকা-পেঁয়াজ দিয়ে মাখা মুড়ি। আমার এবং ওর ব্রেকফাস্ট।

শুধোলাম, ব্যবসা কেমন?

কিষ্ট বলল, ব্যবসা খুবই খারাপ। জঙ্গল-পাহাড়ের লোকদের এমন দুরবস্থা এর আগে কখনও হয়নি। আপনি তো কাবাড়িদের দেখছেন। ওদের তাও তো রোজগার আছে। যাদের আলাদা রোজগার নেই, ভাগচাষ করে, জঙ্গলে-জঙ্গলে ফল-মূল কুড়িয়ে যাদের জীবন কাটে, তাদের আমার মতো মহাজনের কাছ থেকেও কিছু কেনার আর অবস্থা নেই।

তারপর কিষ্ট বলল, আজকাল রোজই প্রায় দশ মাইল করে হাঁটতে হয়। আগে আগে এক এক গ্রামে গিয়ে, তিন-চার মাইল অন্তর অন্তর বিশ্রাম পেতাম। কারো বাড়িতে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিতাম। এখন তিন গ্রাম মিলিয়ে বিক্রি করলেও দিনে পাঁচ টাকা দশ টাকার বেশী বিক্রী নেই।

কিষ্টকে বললাম, আনো দেখি তোমার ঝুড়ি। কি মাল আছে দেখি?

কিষ্ট ঝুড়ি এনে সামনে বসালো।

প্যাণ্ডোরার বাক্সের মতোই আশ্চর্যজনক ঝুড়ি এ। পৃথিবীর তাবৎ জিনিস এই একটি ঝুড়ির মধ্যে আছে। রাবারের চটি, গামছা, ধুতি, শাড়ি। সবই একখানা দু'খানা করে। এ্যানাসিন, কোডোপাইরিন ও কুইনীনের বড়ি। নিরোধের প্যাকেট। তরল আলতা, সিঁদুর, চুল-বাঁধার রিবন, কাঁচি, ছুরি, সাবান, সস্তার বলপয়েণ্ট পেন, চা, চিনি। নেই এমন জিনিস নেই।

পুরুনাকোটে অবশ্য কিষ্ট ব্যবসা করতে আসেনি। কারণ পুরুনাকোটে প্রায় রোজই ট্রাক যাতায়াত করে শীতকালে। ও বরঞ্চ এসেছে এখানে ওর ফুরিয়ে যাওয়া চা-চিনির রসদ কিনে নিতে। ওর আসল বাণিজ্য হলো এমন এমন গ্রামে, যেখানে মাত্র দু'দশ ঘর লোকের বাস—দূরে—দুর্গম জায়গায়।

কিষ্টর সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় কিষ্ট উদ্বেগহীন গলায় ধীরে সুস্থে বলল, এ সাপটা এখানে এল কি করে? এ কামড়ালে তো পাঁচ মিনিটের মধ্যে

আপনি শেষ।

কিষ্টর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি তাকালাম বটে, কিন্তু কোনো সাপই দেখতে পেলাম না।

কিষ্ট যেদিকে তাকিয়েছিল, সেদিকে কতগুলো খড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। কিছু খড় এক জায়গায় জড়ো করে রাখা ছিল। পোড়োগুলোর রাতের খাওয়ার জন্যে।

ভালো করে দেখেও আমি কিছু দেখতে পেলাম না।

কিষ্ট নিজেই বলল যে. (কল্পিত) এ সাপ কামড়ালে মানুষ পাঁচ মিনিটের বেশী বাঁচে না, অথচ সে সাপ দেখতে পাওয়া সত্ত্বেও ওকে বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখালো না।

যারা জঙ্গলে জন্মেছে, জঙ্গলেই বড় হয়েছে, জঙ্গলেই যারা মরবে, তাদের বোধহয় অত সহজে বিচলিত হলে চলে না।

ঐদিকে ভালো করে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মনে হলো, একটা শুকনো খড় মাটি থেকে সোজা উঁচু হয়ে রয়েছে যেন মন্ত্রবলে। পরমুহূর্তেই খড়টা একটু যেন হেলেদুলে উঠল। খড়টা একটা পাটকিলে সাপে রূপান্তরিত হয়ে তার সরু লিক্‌লিকে জিভ বের করে মাথাটা এ-পাশে ও-পাশে হেলাতে লাগলো। ওটা যে একটা সাপ এবং প্রচণ্ড বিষধর সাপ তা কিষ্ট সাউ না থাকলে আমার জানার বা চেনার কোনো উপায়ই ছিল না।

কিষ্টকে চা এনে দিল নকুল ইতিমধ্যে।

সাপটা তার সরু মুখটা ঘুরিয়ে আমাদের কথা শুনছিল।

কিষ্ট ধীরে-সুস্থে একটা চুমুক লাগাল চায়ের গেলাসে। তারপর কাল রাতের আগুনের জায়গা থেকে একটা পোড়ো-কাঠ তুলে নিয়ে সাপটার কাছে এগিয়ে গিয়ে ঝাড়ু দেওয়ার মতো করে কাঠটা দিয়ে সাপটাকে আঘাত করল।

আঘাত করতেই, সাপটার কোমর ভেঙে গেল। কোমরটা মাটিতে লেপটে রইল। আর কোমর থেকে ঊর্ধ্বাংশ ওপরে উঠিয়ে ফণা তুললো সাপটা। তখন তার আসল চেহারাটা দেখা গেল। শরীরটা তিনগুণ চওড়া হয়ে গেল। পাটকিলে রঙ বদলে গিয়ে তার মধ্যে থেকে সবুজ রঙ ফুটে বেরোল। ফণাটা প্রায় দেড়-ইঞ্চি চওড়া হল। তার ফণা ধরার বহর দেখে বোঝা গেল তার বিষ ঢালার ক্ষমতা কতখানি।

কিষ্ট সাউ আবার বাড়ি মারল তার মাথায়। এবারে সাপটা নেতিয়ে পড়ল। কিন্তু তার সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকল। অনেকক্ষণ। মরে যাবার পরও রিফ্লেক্স অ্যাক্‌শানে তার সরীসৃপের শরীরটা কুঞ্চিত ও সম্প্রসারিত হতে

লাগল।

কিষ্ট সাউ আবার এসে চায়ের গেলাস তুলে নিল।

বলল, এটা কি সাপ জানেন ঋজুবাবু? এর নাম কানখুণ্টা? এ সাপ কেউটের চেয়েও মারাত্মক বিষধর।

শুধোলাম, কানখুণ্টা নাম কেন?

কিষ্ট হাসল। বলল, দেখছেন না কান খুঁচানির মতো সরু এর চেহারা। লাউডগা সাপের চেয়েও সরু। সাংঘাতিক সাপ এ।

আমি শুধোলাম, কাঠটা অমন ঝাঁটার মতো করে শুইয়ে মারলে কেন তুমি সাপটাকে?

কিষ্ট বলল, আপনারা তো দামী দামী বন্দুক, রাইফেল ব্যবহার করেন। আমাদের তো অত সব নেই। লাঠি আর টাঙ্গীই আমাদের ভরসা। লাঠি দিয়ে সাপ মারতে হলে ওরকম ঝ্যাঁটার মতো করেই মারতে হয়—শুইয়ে। যদি সোজা করে মারেন, তাহলে ফসকে যাবার সম্ভাবনা বেশী। আর বিষধর সাপের বেলায়, আপনার লাঠি-ফসকানো মানেই প্রাণ-ফসকানো।

নকুল মুড়ি মেখে নিয়ে এল।

বলল, আলো বাপ্পালো, এ সাপ তাঁবুর মধ্যে ঝুপরীর মধ্যে ঢুকে তো যাকে-তাকে কামড়াতে পারে। ছুঁচের মতো সরু তো।

কিষ্ট সাউ বিজ্ঞের হাসি হাসল। বলল, আরে, এ সাপই তো ঢুকেছিল লখীন্দরের বাসর ঘরে।

অন্য সব জায়গার বানিয়ার মতো এখানের বানিয়াও সবচেয়ে ওয়েল-ইনফর্মড। কত জায়গায় ঘোরে ও কত লোকের সঙ্গে মেশে, কত শত খবর রাখে।

এমনভাবে কথাটা বলল কিষ্ট, যেন ও-ও লখীন্দরের সঙ্গে বাসর ঘরে ছিল।

নকুল বিনা বাক্যব্যয়ে কিষ্টর কথা মেনে নিল।

চা-টা খেয়ে কিষ্ট সাউ চলে গেল।

একটু পর সাইকেল চড়ে শ্যামলবাবু এলেন। শ্যামলবাবুর বাড়ি চারছক-এ। উনি কাঠের ঠিকাদারী করেন। ছোট ঠিকাদার। হটবাবুর মালিকদের মতো অত বড় কাজ না ওঁর। পুরুনাকোট আর টিকরপাড়ার মাঝে ওঁর তৈলা আছে। তৈলা মানে জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গল কেটে যে আবাদ করা হয় তা-ই। এমনিতে সব ভালো, তবে শুনতে পাই যে, হাতীর উপদ্রব ভীষণ। সন্ধ্যে হতে না হতেই খড়ের ঘরের চারপাশে হাতী ঘুরে বেড়ায়। অনেক সময় সকালে রোদ ওঠা অবধি থাকে। সারারাত তৈলার লোকেরা তাল-পট্‌কা ফাটায়, কিন্তু

হাতীর দলের ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে। সকালে-বিকালে ময়ূর আসে। ময়ূর চরে বেড়ায় শ্যামলবাবুর তৈলার ভিতরে। অনেক সময় চিতল হরিণের পাল এসে ছবির মতো দাঁড়ায় বেড়া ঘেঁষে। তারপর তাড়া খেয়ে পালিয়ে যায়। তৈলার এলাকা হবে বিশ একর মতো। তিনদিক ঘিরে মাথা উঁচু গভীর বন। একদিকে টিকরপাড়ায় যাওয়ার রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে সেগুনের প্ল্যানটেশান। সেগুনের সামনে সামনে রাস্তা ঘেঁষে বাঁশ বন। কত রকমের বাঁশ। কণ্টা-বাঁশ, নলা-বাঁশ, ডবা-বাঁশ।

এই পুরুনাকোট টিকরপাড়ার রাস্তা ধরে প্রায়ই হেঁটে বেড়াতাম দুপুর বেলা বোষ্টমনালায় চান-টান করার পর। দুপুরে খাওয়ার আগে ক্ষিদে করতাম।

দারুণ লাগে শীতের দুপুরে এই একা-একা পথ চলতে। কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই, গাড়ি নেই, বাস নেই, ট্রাক নেই। আদিগন্ত ঘন গভীর বন ছাড়া আর কিছুই নেই।

পথের দু'পাশে বাঁশ বনে ঝুরু ঝুরু করে উত্তুরে হাওয়া বয়ে যায়। সরু-সরু পাশাপাশি বাঁশে বাঁশে ঘষাঘষি লেগে একরকম কট্‌কটি আওয়াজ বেরোয়। পাতায় পাতায় ছোঁওয়া লেগে দীর্ঘশ্বাসের মতো ভারি নিঃশ্বাস জাগে।

পথের পাশে যেখানে যেখানে বন গভীর, যেখানে রোদ পড়ে না বেশী, সেখানে লজ্জাবতীর কোমল নরম লতারা পাথর ছেয়ে থাকে। ছোট ছোট গোল গোল ফিকে বেগুণী ফুল ফোটে তাতে। জংলী শটী গাছ, কণ্টিকারী, আরও কত-রকম নাম-না-জানা লতাপাতা। প্রজাপতির ঝাঁক গুন্‌গুনিয়ে ওড়ে। রোদের মধ্যে এলে তাদের গা চক্‌চক্‌ করে—আবার ওরা ছায়ায় উড়ে যায়। ওদের ডানার রোদ নিভে যায়। বড় বড় কাঁচাপোকা বুঁবু—বুঁইইই আওয়াজ তুলে নিজেদের আনন্দেই নিজেরা হাওয়ায় পাক খায়। ছোট খুরান্টি হরিণ (মাউস্‌ ডীয়ার) এক দৌড়ে রোদ্দুরে বাদামী ঝলক তুলে রাস্তা পার হয়। ডানদিকের জঙ্গল থেকে বাঁদিকের জঙ্গলে যায়। কোথাও বা, যেখানে জঙ্গল অপেক্ষাকৃত ফাঁকা, সেখানে শুকনো পাতা মচ্‌মচিয়ে ছাই-রঙা নীলগাইয়ের দল দৌড়া-দৌড়ি করে বেড়ায়। নেপালী ইঁদুর (বড় বাদামী কাঠবিড়ালী) বড় বড় গাছের মগডাল থেকে মগডালে লাফিয়ে লাফিয়ে শৃঙ্গার করে।

এ পথে একদিন দেখা হয়েছিল যাত্রার দলটার সঙ্গে। অল্পবয়সী একদল ছেলে, বাড়ি ওদের দশপাল্লা। টিকরপাড়া থেকে হেঁটে আসছিল ওরা পুরুনা-কোটের দিকে। যে যাত্রাদলের মালিক, তার বয়স বড় জোর পঁচিশ হবে। পাহাড়ী তক্ষকের মতো তার গায়ের রঙ, ধুতি পরা, গায়ে নীলরঙা টুইলের

শার্ট, হাতে একটা এইচ্‌-এম্‌-টি হাতঘড়ি, কপালে রসকলি, ডানহাতে হাওয়ায় ওড়া সাদা চামর, কাঁধে একটা লালরঙা থলে। ওর পিছনে পিছনে দলের চার-পাঁচজন মালপত্র সমেত হেঁটে যায়।

আসার সময় ওরা পথের পাশের নদীতে চান করে নিয়েছিল। নদীর পারে পাথরের ওপর বসে পোকাল ভাত খেয়ে নিয়েছিল শুকনো লংকা আর পেঁয়াজ দিয়ে। ওরা পুরুনাকোটে সীতাহরণ পালা করবে বলে বায়না পেয়েছিল। পুরুনাকোট থেকে ছোট্‌কুঁই যাওয়ার পথে ফরেস্ট গেট-এর সামনে রাস্তার উপর হ্যাজাক জ্বালিয়ে রাতে সীতাহরণ পালা হত। পথের উপর একদিকে ছেলেরা, অন্যদিকে মেয়েরা ধুলোর মধ্যে বসে থাকত সারারাত ঐ প্রচণ্ড শীতে। সীতাহরণ পালার গান রিন্‌ রিন্‌ করে বাজতো চতুর্দিকের বন-পাহাড়ে। আমাদের ডেরা থেকেও শুয়ে শুয়ে ঘুঙুরের শব্দ আর ওদের চিকণ তরুণ গলার অস্পষ্ট রেশ শোনা যেত রাতভর।

এই বন, এই পাহাড়, এই নদী-নালা, এই লোকজন, পশু-পাখি এরা সকলে মিলে আমার মধ্যে কি যেন এক ঘোরের সৃষ্টি করে। কলকাতার সব কথা ভুলে যাই। এমনকি মাঝে মাঝে তোমার কথাও ভুলে যাই।

অবশ্য তোমার কথা একেবারে ভোলা যায় না। তোমার একটা ছবি আছে আমার কাছে। সেটা সবসময় আমার কাছেই থাকে। তোমার ছোটবেলার ছবি। পার্ক স্ট্রীটের বোম্বে ফোটো স্টোরস্‌-এ তুলেছিলে তুমি।

যে শাড়িটা পরে তুমি ছবিটা তুলেছিলে, সে শাড়িটার কথা আমার এখনও মনে আছে। হাল্‌কা কচি-কলাপাতা-রঙা একটা টাঙ্গাইল শাড়ি। পাড় ছিল তার কালো-রঙা। কনুই অবধি ব্লাউজ পরেছিলে তুমি। গলায় একটা গুজরাটি মঙ্গলসূত্রম্‌। কানে মুক্তোর ইয়ারটপ্‌। ডান হাতে ঘড়ি—কালো ব্যাণ্ডের। বাঁ হাতের অনামিকায় একটা সীসের আংটি। বাঁ হাতটা তোমার ঊরুর ওপর রাখা। তার ওপরে ডান হাত। তোমার সুন্দর আঙুলগুলো; তোমার আশ্চর্য গড়নের সুন্দর নখ। তোমার উজ্জ্বল চোখ দুটি, তোমার ঠোঁটের ভাঁজ, তোমার সুকুমার চিবুক, সব মিলিয়ে কী এক আশ্চর্য হাসির আভাস তোমার সমস্ত মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে আছে। তোমার সুন্দর গ্রীবা, লো-কাট ব্লাউজে দৃশ্যমান তোমার কণ্ঠার হাড়। তোমার সেই সমস্ত তুমিকে আমি সবসময় আমার বুকের মধ্যে নিয়ে বেড়াই।

তোমার অনেক ছবি আমার কাছে আছে। নৈনিতাল-এর ছবি, দার্জিলিং-এর ছবি, দীঘার ছবি, পুরীর ছবি, কিন্তু কোনো ছবিই এ ছবির মতো নয়। এ ছবিতে আমার নয়না সোনা এক সরল অপাপবিদ্ধ ভালোবাসায় ভাসছে।

এখন তুমি অন্যরকম হয়ে গেছ। কত অন্যরকম!...

আমি অন্যমনস্ক হয়ে নালার দিকে তাকিয়েছিলাম।

একদল হনুমান ওপার থেকে জলে নেমে জল খাচ্ছে। মা-হনুমানের বুকে ছোট্ট সুণ্টুনি-মুণ্টুনি বাচ্চা। বাবা-হনুমানের রকমসকম ভারিক্কী। সে এদিকে-ওদিকে সাবধানী চোখে তাকাচ্ছে।

শ্যামলবাবু আমার সামনেই বসেছিলেন। কতক্ষণ বসেছিলেন, কখন চায়ের গেলাস খালি করে ফেলেছিলেন, খেয়ালই হয়নি আমার।

হঠাৎ উনি বললেন, ঋজুবাবু, একবার তৈলায় রাতে না বসলে তো হয় না। হারামীদের জ্বালায় আর পারি না।

আমি বললাম, বসে লাভ কি? হাতী মারার পারমিট কোথায়?

উনি বললেন, হাতী না, শুয়োর। হাতীর উপদ্রব এখন কম। শুয়োরের জ্বালায় তো কিছুই আর রাখা যাচ্ছে না। খরগোসও আসে ডজনে ডজনে। আর দিনের বেলা শ'য়ে শ'য়ে পাখি। আমার চাষবাস মাথায় উঠেছে।

আমি শুধোলাম, তৈলায় কি বুনছেন এখন?

শ্যামলবাবু বললেন, বিড়ি (কলাই ডাল) কুলথী, অড়হর, রশি, চীনাবাদাম। লাগিয়েছি সবই, কিন্তু কিছুই রাখা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে হারামী টিয়া আর বগারী।

আমি হাসলাম।

উনি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, আপনি হাসছেন? দিনের বেলা চারটে মাগীকে রাখতে হয়েছে ক্ষেত পাহারা দেবার জন্যে। সবসময় তারা ক্যানেস্তারা পেটাচ্ছে, তবুও পাখির কিছু ভ্রুক্ষেপ আছে?

আমি বললাম, ঠিক আছে। বিকেল-বিকেল গিয়ে বসব এখন একদিন। ঝুপরী বানিয়ে রাখবেন একটা জায়গা মতো।

শ্যামলবাবু বললেন, প্রথম রাতে আসে না। আসে শেষরাতে। সারারাত কেন কষ্ট করে বসবেন? তার চেয়ে রাত বারোটা-একটায় বসলেই তো হবে।

আমি বললাম, ঠিক আছে। তাই যাবো।

উনি বললেন, অত রাতে এখান থেকে এতটা পথ যাওয়ার কি দরকার হেঁটে? তার চেয়ে তৈলাতে গিয়ে শুয়ে থাকবেন ঘরে। আমাদের সঙ্গে না হয় খাবেন, সেদিন রাতে; খিচুড়ি আর ডিমভাজা খাবেন। কেমন?

বললাম, আচ্ছা।

তারপর শুধোলাম, অনিবাবু কেমন আছেন? এবারে এসে অবধি দেখা হল না ও'র সঙ্গে।

শ্যামলবাবু বললেন, আছেন একরকম। বয়স তো হয়েছে। তার উপরে একটা বড় স্ট্রোক হয়ে গেছে। এখন যেমন থাকা যায় তেমনই আছেন।

এরপর একটু গল্পগুজব করার পর শ্যামলবাবু উঠলেন।

ততক্ষণে রোদ বেশ কড়া হয়েছে। তোয়ালে ও জামাকাপড় কাঁধে ফেলে সর্ষের তেলের শিশি হাতে ঝুলিয়ে পাইপটাতে ভালো করে তামাক ভরে আমি বোষ্টম নালার কজওয়ের দিকে রওনা হলাম।

কজওয়ের বাঁ দিকে জল বেশ গভীর। জায়গায় জায়গায় পাথরের মধ্যে মধ্যে প্রায় একমানুষ জল আছে। চান করে খুব আরাম এখানে। নদীর মধ্যে মধ্যে সাদা বালির চর—মসৃণ : মেয়েদের ঊরুর মতো। বড় বড় শলাই গাছ—মোটা মোটা গুঁড়ি। অন্যান্য বড় গাছের মতো। কালো পুষ্ট শিকড় বালি ফুঁড়ে বেরিয়ে রয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন অনেকগুলো ছোট বড় কুমীর রোদ পোহাচ্ছে।

এখানে নালাটা একটা প্রপাত মতো সৃষ্টি করে প্রায় বারো ফিট উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়েছে নিচের জলে। সেখানে কাঁচা বাঁশের বেড়া বানিয়ে বাঁধ দিয়েছে গ্রামের লোকেরা মাছ ধরার জন্যে। নানারকম মাছ ধরা পড়ে এখানে, পাহাড়ী মাছ; ছোট ছোট।

জল কম হলে কি হয়, প্রচন্ড স্রোত নদীতে। পা রাখা যায় না। মনে হয়, হাতী ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার বল রাখে এতটুকু নদী। সাঁতার কাটারও উপায় নেই পাথরের জন্যে। এক জায়গায় সাঁতার কেটে ভেসে থাকাও যায় না। জলের তোড় মুহূর্তের মধ্যে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে পাথরে ধাক্কা মারে।

যেখানে চান করতে পেঁছিলাম আমি, সে জায়গাটা রাস্তা থেকে দেখা যায় না। নদীটা একটা সমকৌণিক বাঁক নিয়েছে প্রপাতটার আগে।

সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে রোদের মধ্যে উত্তপ্ত পাথরে বসে সারা গায়ে সর্ষের তেল মাখতে মাখতে ভীষণ জংলী জংলী মনে হয় নিজেকে। এই পাথর, বালি, আকাশ, জল, ঘাস, গাছ, পাখি, পাহাড়ের সঙ্গে নিজেকে দারুণ একাত্ম মনে হয়।

জলে যখন ঝাঁপিয়ে পড়লাম জল ছিটকে উঠলো চারদিকে। হাজার হাজার হীরে ঝলমল করে উঠলো অনেকখানি পরিমন্ডলে সকালের রোদ্দুরে।

নদীর মধ্যেই অটুট অবস্থায় থেকে যাওয়া একটা বন্ধন গাছের গুঁড়ির উপর এতক্ষণ একটা বাদামী আর বেগুনীতে মেশা মাছরাঙা বসেছিল। আমি জল ছিটিয়ে জলে নামার সঙ্গে সঙ্গে সে একটা অদ্ভুত ব্যথাতুর স্বরে ডাকতে ডাকতে নদীর উজানে উড়ে গেল।

বন্ধন গাছের ডাল খুব শক্ত। এ গাছের ডাল দিয়ে গোরুর গাড়ির চাকা

বানানো হয়। রেল লাইনের স্লীপারও হয় এই কাঠে।

নদীটা বোধহয় পথ বদলেছিল, যে কোনো নারীর মতো, ওরা বড় ঘন ঘন পথ বদলায়; মন বদলায়। তার নতুন পথে এই গাছটা পড়ে গিয়েছিল। তার ডাল-পালা, শাখা-প্রশাখা সব ভেঙেচুরে নিয়ে গেছে নারী নদী তার নিজের চলার তাগিদে, তার নিখাদ স্বার্থপরতায়। তবুও নির্লজ্জের মতো এই শক্ত বিশ্বস্ত মধ্যবয়স্ক পুরুষ গাছটা, তার ঋজু শরীরে এক কোমর জলের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, জানিয়ে দিচ্ছে যে, তার হৃদয়েতে পথ কেটে এ নদী চলে গেছে অন্য হৃদয়ে; কিন্তু সে নিজে পথ বদলায়নি।

এ গাছটা আমারই মতো বোকা। তোমারই মতো কোনো নদী তাকে নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বস্বহৃত করে চলে যাবার পরও সে তবু একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ও ঘন ঘন জায়গা বদলাতে, মন বদলাতে পারেনি। তাই ও ঠকেছে; ঠকছে। পুড়ছে রোজ-দিন ঠা-ঠা রোদ্দুরে। এক কোমর জলে দাঁড়িয়েও পুড়ে ছাই হচ্ছে। আমার মতই ও বুঝি এখনও জানে না যে একই জায়গায়, একই প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ও কখন নিজেও বন্ধ্যা হয়ে গেছে।

চান শেষ হয়ে এসেছিল। আমি বালিতে উঠে পাথরে দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে গা মুছছি, এমন সময় জীপের এঞ্জিনের আওয়াজ ও টিউলির উত্তেজিত গলা শুনলাম. কজওয়ের দিক থেকে। আমার নাম ধরে টিউলি খুব জোরে জোরে ডাকছে। আমাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলছে।

আমি তাড়াতাড়িতে শর্টস্‌টা পরে নিয়ে খালি গায়েই তোয়ালে আর ছাড়া-জামাকাপড় হাতে ওদিকে দৌড়ে গেলাম। কজওয়ের কাছে পেঁছতেই টিউলি বলল, বাবু শীগগির চলুন, কালিয়া গাছ চাপা পড়েছে।

টিউলি জীপটার স্টার্ট বন্ধ না-করে, জীপের মুখটা ঘুরিয়ে কজওয়ের ওপরেই দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। আমি ওখানে পেঁছতেই ও সরে বসল। স্টীয়ারিংয়ে বসে আমি যত জোরে পারি জীপ ছুটিয়ে চললাম। ডেরা অবধি একই রাস্তা। তারপর ডেরার ডানদিক দিয়ে জঙ্গলের ভিতরে চলে গেছে পায়ে-চলা পথ। পায়ে-চলা যদিও, তবে জীপ যাওয়ার মতো করে রেখেছিল ওরা ডালপালা কেটে শীতের প্রথমেই. কারণ কটক থেকে ঠিকাদার বাবুরা এলে জঙ্গলের বেশীর ভাগ কূপ ওরা ঘুরে ঘুরে দেখেন। কমপক্ষে মাসে একবার দু'বার আসেনই ওঁরা।

একটা পাহাড় টপ্‌কে যখন অকুস্থলে গিয়ে পেঁছলাম, তখন দূর থেকে দেখতে পেলাম একটা জায়গায় জঙ্গলের মধ্যে পথ থেকে বেশ দূরে ওরা সকলে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জীপ থামিয়ে টিউলির সঙ্গে দৌড়ে ওদের কাছে গিয়ে পোঁছলাম। কিন্তু তখন কারোই কিছু করার ছিল না।

জায়গাটায় কপিসিং ফেলিং হচ্ছিল। সাউন্ড গাছ দেখে দেখে দিন সাতেক আগে পুরুনাকোটের রেঞ্জার আর ফরেস্ট গার্ডরা হাতুড়ির মতো মার্কা দিয়ে চিহ্নিত করেছিলেন গাছগুলোকে। এসব জঙ্গলে এরকম দুর্ঘটনা বড় একটা ঘটে না। চিরদিনই ওরা বড় বড় মহীরুহকে টাঙ্গী দিয়ে কেটে কেটে একসময় ঘটনাবিহীনভাবে মাটিতে ফেলে দেয়। বহু বছরের পুরনো গাছগুলো যখন তাদের সমস্ত শাখা-প্রশাখা, লতা-পাতা, তাদের মগডালে-ঝোলা মৌচাক, গুঁড়িতে-লতানো স্বর্ণলতার-জাল, ডালে ডালে পাহাড়ী পাখির বাসা, হাজার হাজার কাঠ পিঁপড়ে ও সাপখোপের ছানা-পোনা সমেত আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে, তখন দেখতে ভীষণ কষ্ট হয়। শেষবারের মতো তাদের শাখা-প্রশাখা আকাশের দিকে হাত তুলে প্রতিবাদ জানায়; আর্তনাদ করে তারা।

এই ঝাঁকরা তেঁতরা গাছটা এমন অনেক অনেক গাছের মৃত্যু-যন্ত্রণার প্রতিশোধ নিল বোধহয় কালিয়ার ওপর। গাছটা ফেলছিল ওরা উপত্যকার দিকেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কালিয়া গগনের সঙ্গে কি সব রসিকতা করছিল, হাসছিল ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে। ও টাঙ্গী হাতে একটা আলগা পাথরের ওপর দাঁড়িয়েছিল উল্টোদিকে। কি করে, কেউ জানে না, পাথরটা হঠাৎ গড়িয়ে যায় উপত্যকার দিকে। কালিয়া সামলাতে না পেয়ে পড়ে যায় এবং ও পাথরটার সঙ্গে গড়িয়ে যায় নীচে। ততক্ষণে এসে গেছে, এসে গেছে, সমস্ত আকাশ ডালপালার সবুজ মেঘে ঢেকে গাছটা কালিয়ার বুকের ওপর এসে পড়ে। পাঁজরাগুলো সব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় কালিয়ার। মাথাটা আছাড় খায় একটা তিনকোণা পাথরের উপরে। পোড়ো দিয়ে যখন ওরা গাছটাকে টেনে সরায় একপাশে, তখন কালিয়াও ছেঁচড়ে চলে যায় অনেকখানি কাঁটা-পাথরের উপর দিয়ে। তারপরে গাছটাকে আলাদা করা হয় কালিয়ার শরীরের উপর থেকে। কালিয়া একটু জল খেতে চায়, ওর ছোট মেয়ের নাম ধরে একবার ডাকে।

ওরা কেউ কোনো কথা বলছিল না। ওদের মুখ ভাবলেশহীন।

আমাকেই ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উত্তেজিত, বিচলিত ও ভাবিত দেখাচ্ছিল। কারণ আমি শহরের লোক। আমার এসব দেখা অভ্যেস নেই।

ওদের মুখগুলো দেখে মনে হচ্ছিল, ওরা এই মৃত্যুকে 'ইটস্ অল ইন দা গেমে'র মতোই মেনে নিয়েছে। ওরা জানে এরকম হতেই পারে; হয়ও।

ঠিক হলো, হটবাবু, টিউলি, দুর্গা ওরা সকলে মিলে এখুনি জীপে

করে কালিয়ার মৃতদেহ নিয়ে যাবেন পম্পাশরে, কালিয়ার গ্রামে।

কালিয়া ঘুমিয়ে থাকবে পম্পাশর আর লবঙ্গীর মাঝমাঝি কোনো ছায়াচ্ছন্ন জায়গায়। সেখানে আরামে শুয়ে শুয়ে ও কন্দমূলের গন্ধ পাবে নাকে। চারধারে মুতুরি ও শিয়ারি লতা গজিয়ে উঠবে। গিলিরি ফুলে একসময় ছেয়ে যাবে জায়গাটা। কখনও বা না-নউরিয়া ফুলের লাল লাল থোকা ফুটবে সেখানে। আজ থেকে একবছর, দু'বছর, তিনবছর পরে কালিয়ার কিশোর ছেলে শান্ত চোখে চেয়ে থাকবে তার বাবার স্মৃতির দিকে। ওর বাবার কাছ থেকে কিছুই পাবে না ও। ব্যাঙ্কের টাকা পাবে না, কভেনাণ্টেড চাকরী পাবে না। কাবাড়ির ছেলে কাবাড়ি তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত একমাত্র সম্পত্তি—ট্রাকের ফেলে-দেওয়া টায়ার দিয়ে বানানো বাবার এক জোড়া ছেঁড়া চটি এবং চক্‌চকে ধারালো টাঙ্গীটা হাতে নিয়ে কোনো ঠিকাদারবাবুর ক্যাম্পের সামনে এসে দাঁড়াবে ও। ওর বাবার মতো ও কূপ কাটবে, আফিং-এর গুঁড়ো সেদ্ধ করে খাবে জলে, খিদে নামক যন্ত্রণাটা নিবৃত্ত করতে। রাতের বেলা আগুনের খুব কাছে কুকুরের মতো ও শরীরটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে শীতের হাত থেকে বাঁচতে চাইবে। তারপর একদিন হাসতে হাসতে, সরল প্রতিবাদহীন হাসি দিয়ে সব দুঃখ ভুলিয়ে রাখতে রাখতে একদিন ওর বাবারই মতো, একটা ঠাট্টার মতো পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে।

পম্পাশরে যাবার আগে হটবাবু কটকে দুর্ঘটনার খবর পাঠিয়ে দিয়ে-ছিলেন অন্য এক ঠিকাদারের মারফত।

কাবাড়িরা সকলেই আলোচনা করছিল, কালিয়ার পরিবারকে কোনো সাহায্য দেবেন কি না বাবুরা। তারপর নিজেরাই বলছিল, বাবুরা লোক খুব ভালো।

কিছু টাকা আমি কালিয়ার পরিবারের জন্যে দিয়ে দিতে পারতাম। দিতে খুব ইচ্ছাও করেছিল। কিন্তু হটবাবু বললেন, সৎকার করার মতো অনেক টাকা ও'র কাছে আছে। তাছাড়া বাবুরা কালই চলে আসবেন খবর পাওয়া মাত্র। বাবুরা নিশ্চয়ই বন্দোবস্ত করবেন। আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি শুনলে ও'রা রাগ করবেন।

কালিয়ার মৃত্যুর জন্যে সেদিনের মতো ডেরার সব কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যে সব কাবাড়িরা ছিল তারা রান্নাবান্না করে খেয়ে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছিল। কেউ কেউ বা নালার উপরে পরিষ্কার সাদা বালিতে অথবা পাথরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কেউ টাঙ্গীতে ধার দিচ্ছিল। কেউ সাজিমাটিতে কাপড় কাচছিল নালায় নেমে।

আমি একটা বই নিয়ে ডেরার থেকে একটু দূরেই একফালি ফাঁকা ঘাস-বনে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম উপুড় হয়ে। কালিয়ার ব্যাপারটা মন থেকে যাচ্ছিল না কিছুতেই। বারে বারেই ফিরে আসছিল।

বিকেল সাড়ে তিনটে-চারটে বাজে প্রায়। মনটা একটু চা-চা করছে। নকুল আজ নেই। এখনই উঠতে হয়। নিজেরই গিয়ে চা বানাতে হবে। নইলে চা নেই কপালে।

উঠব-উঠব ভাবছি।

গাছের ছায়াগুলো দীর্ঘতর হয়ে এসেছে ঘাসের গালচের ওপর। ময়ূর ডাকছে ক্কেঁয়া-ক্কেঁয়া করে জঙ্গলের গভীর থেকে। একটা কোটরা হরিণ বাঘমুণ্ডার দিক থেকে অনেকবার পর পর ডাকল। কালকের বাঘ ও বাঘিনীর মধ্যে কারো দেখা পেয়ে থাকবে বোধহয় ও।

ঘাসের ফালিটুকু ছেড়ে আমি উঠেছি, এমন সময় ডেরার দিক থেকে হঠাৎ একটা শোরগোল শোনা গেল। তারই মধ্যে একটি রমণীকণ্ঠের আওয়াজ।

আমি গিয়ে পেঁছতেই যা শুনলাম, তাতে প্রায় বাক্‌রোধ হয়ে গেল।

বাঘমুণ্ডা গ্রামের দুটি মেয়ে সুঁড়ি পথ দিয়ে পুরুনাকোটে আসছিল। দু'জনের মধ্যে একজন আসন্নপ্রসবা। অন্যজন তার বর্ষীয়সী ননদ। পুরুনা-কোটে একটা ফ্রি-ডিস্‌পেনসারী ছিল। সঙ্গে বোধহয় দু'বিছানার হাসপাতাল। গর্ভবতী মেয়েটির কি সব অসুবিধা থাকাতে ননদ আর বৌদি মিলে এখানে আসছিল পাঁচ মাইল হেঁটে জঙ্গলের পথে। ডাক্তারখানায় দেখিয়ে তারপর এখানেই বৌদির দাদার বাড়িতে রাত কাটাবে ওরা। তারপর পরদিন সকালে আবার হেঁটে ফিরে যাবে। এই সঙ্গে পুরুনাকোটে সীতাহরণ পালা দেখবার লোভটাও ছিল।

মেয়েদের কথা কিছুই বলা যায় না। হয়তো অসুখটা একটা ছুতো, যাত্রা দেখাটাই আসল। আর সেই তরুণদের যাত্রার দলটি যে আরো কতদিন ধরে সীতাকে চুরি করবে তা আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। রোজ রাতেই সীতা একবার করে চুরি যাচ্ছিল। তবে দণ্ডক বনের মতোই এ বনের পরিবেশ। সীতাহরণ এখানে যেমন জমে, তেমন শহরে জমে না।

বৌদি আর ননদ যখন নালার পিছনের পাকদণ্ডী পথ দিয়ে পুরুনাকোটের দিকে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ বৌদির শরীর খারাপ হয়। ছাব্বিশ বছরের বৌদি নালার পাড়ে সেগুনের প্ল্যান্‌টেশানের মধ্যে জীবনে অষ্টমবার মা হন, অবলীলায় একটি সুস্থ কিন্তু অপুষ্ট ছেলের জন্ম দিয়ে।

এ পর্যন্ত ঘটনাটা মসৃণভাবেই ঘটেছিল। বৌদি এবং ননদিনী দু'জনের

কেউই বিন্দুমাত্র ঘাবড়ায়নি। দু'জনেই নিজেদের কর্তব্য যথাসময়ে এবং সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন করেছিল। কিন্তু নাড়ীটা কাটার মতো কিছুই ছিল না ওদের সঙ্গে। জঙ্গলের মধ্যে থেকে ডেরার চারপাশে ছড়িয়ে-থাকা কাবাড়িদের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে নন্দিনী ওদের সাহায্য চায়। সাহায্য চাইতে আসতেই ওরা একসঙ্গে যখন কথা বলে ওঠে সকলে মিলে, তখনই আমি শুনতে পাই ওদের গলা দূর থেকে।

আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন সার্জন পাইকারা সার্জারী সমাধা করে ফিরে আসছে। তার চোখেমুখে বিস্ময় বা বীরত্বব্যঞ্জক কোনোরকম চিহ্নই নেই। এমন ভাব, যেন ও আকছার এরকম ভলান্টিয়ারীং করেই থাকে।

ও টাঙ্গী হাতে ফিরে আসতেই একজন কাবাড়ি শুধালো, কি করে নাড়ী কাটলি ?

পাইকারা বলল, ঐ মেয়েটা দু'হাত দিয়ে ধরল, আমি কেটে দিলাম খ্যাঁচ্ করে।

তারপরই বলল, ওকে একটু ফ্যান দিয়ে আসতে হবে। মেয়েটা বলছিল, খালাস যখন হলামই, তখন ভালো করে যাত্রাটা দেখব আজ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ফুটন্ত হাঁড়ি থেকে ঘটি করে এক ঘটি ফ্যান ঢেলে নিয়ে পাইকারা আবার নালা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাইকারা ফিরে আসার মিনিট পনেরো পরেই দেখলাম, ট্যাঁ ট্যাঁ করে টিয়াপাখির মতো কাঁদতে থাকা নবজাত শিশুটিকে কোলে নিয়ে একটি লাল শাড়ি পরা মেয়ে এবং তার পিছনে গেরুয়া শাড়ি পরা আরেকজন ডেরা থেকে পঁচিশ-তিরিশ হাত সামনে দিয়ে নালার জল ও পাথর টপ্কাতে টপ্কাতে পাকদণ্ডী দিয়ে পুরুনাকোটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

পাইকারাকে কে যেন বলল, ভালোই হলো শালা, তোর বৌ যখন বিয়োবে তখন আর দাই ডাকতে হবে না তোর। তুই তো সব শিখেই গেলি।

পাইকারা হাসল। তারপর বলল, তোর বৌ যখন বিয়োবে তখনও ডাকিস, তোর খরচাও বাঁচিয়ে দেবো।

ওরা এমন করে ছেলেমেয়ে হওয়ার কথা বলছিল, যেন গোরু মোষেরই বাচ্চার কথা বলছে।

হটবাবু রাত ন'টা নাগাদ ফিরে এলেন। তাঁরা ফিরে আসার আরো তিন-চার ঘণ্টা পর প্রায় রাত একটা নাগাদ রঘুবাবু এলেন, কটক থেকে জীপ নিয়ে। ঠিকাদারবাবুদের সিনীয়র পার্টনার।

খবর পাওয়ামাত্র উনি বেরিয়ে পড়েছিলেন।

রঘুবাবুর আসার খবর পেয়ে সব কাবাড়িরা ঝুপরী থেকে বেরিয়ে এল। টিউলি খিচুড়ির হাঁড়ি চাপালো বাইরের আগুনে।

রঘুবাবু এসে বসলেন। ওঁকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। উনি অনেক কথা বলছিলেন—কিছু কিছু স্বগতোক্তির মত।

রঘুবাবুর বিশেষ প্রিয় ছিল কালিয়া।

রঘুবাবু বললেন যে, কালিয়ার পরিবারকে এক হাজার টাকা দেওয়া হবে। ঐ টাকার অঙ্ক শুনে বেশীর ভাগ কাবাড়ির মুখই আগুনের আলোয় এমন দেখালো যে, মনে হলো ওদের আপশোস হচ্ছে কালিয়ার বদলে ওরা কেন গাছের নীচে পড়ল না।

ওদের জীবন আড়ম্বরহীন। চাহিদা সামান্য। প্রাপ্তিও সামান্যই। ওদের কাছে একসঙ্গে হাজার টাকা হাতে পাওয়া, না চাঁদ হাতে পাওয়া!

রঘুবাবু বলছিলেন কালিয়া বহুদিনের লোক। কালিয়ার বিয়েতে তিনি বরযাত্রী গিয়েছিলেন। এখনও স্পষ্ট মনে আছে, সেই বিয়েতে হরিণের মাংস আর পানমৌরী খাওয়ার কথা। রঘুবাবু বললেন, কাল ভোরেই উনি পম্পাশর যাবেন।

শুধোলাম, টাকাটা কি কালিয়ার বৌকে দেবেন?

রঘুবাবু বললেন, বৌকে টাকা দিলে কালিয়ার ভাইয়েরা দেখতে দেখতে নেশা করেই এ টাকা উড়িয়ে দেবে। তা না করে ভাবছি কালিয়ার বৌ ও ছেলের নামে নিজে দেখেশুনে কিছুটা জমি কিনে দেবো। ভালো ধানের জমি। যাতে ওদের কোনো অসুবিধা না হয়।

তারপর বললেন, আসল ব্যাপারটা কি জানেন? এই কাবাড়িরা টাকা জমালে হয়তো সকলেই কিছু টাকা জমাতে পারতো। এরা, যাদের ভাগ-চাষ ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই—তাদের চেয়ে অনেক ওয়েল-অফ্। কিন্তু এত ছেলেপেলে হয় এদের এবং এত নেশা করে যে, সুদূর ভবিষ্যতেও আমি কোনো আশা দেখি না। একবার, এরা যখন বাড়ি যায়, নিজে হাতে কনট্রা-সেপ্টিভের প্যাকেট কিনে কিনে প্রত্যেক বিবাহিত লোককে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, দু'তিনটির বেশী ছেলেপুলে হলে মাইনে কেটে দেবো। নানারকম ভয় দেখিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। এদের জনে জনে জিজ্ঞেস করুন, পঁচিশ বছরের ছেলের পাঁচটা করে ছেলেমেয়ে কম করে। কি করে এদের অবস্থা ভালো হবে বলতে পারেন?

তারপর একটু থেমে মাথাভর্তি সাদা চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, আমি ছোটবেলা থেকেই এদের মধ্যে বড় হলাম, এদের মধ্যেই বাস করি। যখন বয়স

অল্প ছিল তখন অনেক কিছু ভাবতাম, বুঝলেন। এটা হবে, সেটা হবে, এই লোকগুলোর ভালো হবে। কিন্তু কিস্‌-সু হলো না মশায়। মোটা মোটা নেতাগুলো ফুলে কলাগাছ হলো—ঘুষ-ঘাষ আর চুরি-জোচ্চুরিতে দেশটা ছেয়ে গেল। অল্প কয়েকজন লোক মিলে জনগণের নামে দেশটার সর্বনাশ করে ফেলল।

রঘুবাবুর খাওয়া-দাওয়া হতে হতে প্রায় দুটো বাজল। তারপরও ক্যাম্পের মধ্যে লণ্ঠন ঝুলিয়ে উনি অনেকক্ষণ হিসাব-টিসাব দেখলেন কাঠের কাবাড়িদের। তারপর যখন লণ্ঠনের ফিতেটা কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন তখন রাত প্রায় আড়াইটা।

এই পলিতকেশ তীক্ষ্ননাশা বৃদ্ধকে মনে মনে আমি খুব সমীহ করি। যে-সব লোক নিজেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।

উনি প্রথম যৌবনে যখন এখানে কাজ করতে আসতেন, তখন আসতেন গোরুর গাড়িতে। বেলা চারটের পর আর লোক খুঁজে পাওয়ার উপায় ছিল না। হাতী, বাইসন, বাঘ, বুনো মোষ ইত্যাদি ইত্যাদি এত ছিল এসব জঙ্গলে তখন। বেলা চারটের সময়েই গোরুর গাড়ি থামিয়ে, বড় আগুন করে, শট্‌গানে গুলি ভরে রাখতে হতো। রান্নাবান্না হতো, খাওয়া হতো, তারপর রাতে ছইয়ের মধ্যে শুয়ে থাকতে হতো, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার জন্য তৈরী হয়ে। কতবার বাঘ তার গাড়ির বলদ কিংবা মোষ নিয়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। হাতীরা একবার গোরুর গাড়ি নিয়ে ফুটবল খেলেছিল। উনি আগেই পালিয়ে গিয়েছিলেন। ওঁর টিনের তোরঙ্গটা একটা টেনিস বলের মতো হয়ে গিয়েছিল দুমড়ে মুচড়ে। সেই তোরঙ্গটা এখনও রেখে দিয়েছেন উনি। সকলকে দেখান।

একসময় তাঁবুর মধ্যে রঘুবাবুর নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই।

রাত তখন কত হবে কে জানে!

হঠাৎ অনেকগুলো কুকুরের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কুকুরগুলো একই সঙ্গে ডাকছে। মনে হলো নালার দিক থেকেই ডাকছে। জলের মধ্যে লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে।

আমি উঠেই দেখলাম, রঘুবাবু আমার আগেই উঠেছেন।

কাবাড়িরাও সকলে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে। সকলেই নালার দিকে চেয়ে আছে।

চাঁদটা তখন বেশ উপরে উঠেছে, কিন্তু নালার মধ্যে দুপাশের বড় বড়

গাছের ছায়া পড়েছে বলে কিছুই দেখা যায় না।

থ্রি-সিক্স্টি-সিক্স্ ম্যাগাজিন রাইফেলটা আর একটা পাঁচ ব্যাটারীর বন্ডের টর্চ হাতে করে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা অবস্থাতেই বাইরে এলাম আমি।

রঘুবাবু হাত দুটো পিছনে রেখে একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ঐদিকে তাকিয়ে আছেন।

আমি গিয়ে পেঁছিতেই বললেন, বুনো কুকুররা একটা সম্বরকে তাড়িয়ে নিয়ে এসে জলে ফেলেছে। গোটা কয়েককে মেরে দিন। এই কুকুরগুলোর জন্যে জংলী জানোয়ারদের আর বাঁচার উপায় নেই। এমনিতেই তো স্পট লাইটের শিকারীরা সম্বর প্রায় সব শেষ করে এনেছে।

টর্চের আলো ফেলা সত্ত্বেও কুকুরগুলোর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আলোতে পরিষ্কার দেখা গেল একটা মাঝারি সাইজের মাদী সম্বর জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ও ভেবেছিল জলে গিয়ে পড়লে বুঝি কুকুরদের হাত থেকে বাঁচবে ও। কিন্তু লাল্চে বুনো কুকুরগুলো দূর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে ওর কাঁধে পিঠে উঠে এক এক কামড়ে এক এক খাবলা মাংস তুলে নিচ্ছে।

টিউলিকে আলোটা ধরতে বলে, রাইফেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পর পর আমি চারটে কুকুরকে মারলাম। দুটো তো শূন্যেই মরলো। লাফিয়ে সম্বরটার ঘাড়ে পড়তে যাচ্ছিল, তখন গুলি করেছিলাম। সে দুটো কুকুর ঝপাং করে জলের মধ্যেই পড়লো।

চারটে কুকুর পড়ে যেতেই এবং রাইফেলের আওয়াজে বন-পাহাড় গম্গম্ করে উঠতেই অন্যান্য কুকুরগুলো যেন ভোজবাজীর মতো অদৃশ্য হয়ে গেল।

সম্বরটা ঘ্বাক্ ঘ্বাক্ ঘ্বাক্ করে ডাকছিল। তার ভোঁতা ধাতব ডাক জল পেরিয়ে ওপাশের গাছে-গাছে ধাক্কা খেয়ে আবার এ পারে ফিরে আসছিল।

রঘুবাবু বললেন, সম্বরটাকে বাঁচান বোস সাহেব। মাদী সম্বর।

বাঁচান বললেই বাঁচানো যায় না। সম্বরের পায়ের চাঁটে চিতাবাঘের মাথার খুলি ফেটে যেতে দেখেছি আমি স্বচক্ষে। জ্যান্ত সম্বরকে ধরা বা তাকে ধরে আনার মতো ক্ষমতা কাবাড়িদের ছিল না। রঘুবাবু এ সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশী ওয়াকিবহাল ছিলেন। তবু মন নরম বলেই—উনি তখন সম্বরটার দুরবস্থা দেখে অমন একটা ইম্প্রাকটিকেবল্ অনুরোধ করেছিলেন। সম্বরটাকে বাঁচাতে আমিও কম চাইনি।

নিরুপায় হয়ে নদীতে নেমে গেলাম। আমার পিছনে টর্চ ধরে টিউলি এবং সঙ্গে দুর্গা।

কুকুরগুলো পালিয়ে যাওয়ার পরও সম্বরটা কেন যে উঠে পালাচ্ছিল না

আমি তাই-ই ভাবছিলাম। সম্বরটা তেমনিই জলের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। এখন কোনো আওয়াজও করছিল না। একেবারে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল।

নদীতে নামতেই মনে হলো, গোড়ালি ও পায়ের পাতা বুঝি কেউ কেটে নিল। শেষ রাতে নদীর ঠাণ্ডা জল থেকে ফ্রিজ খুললে যেমন ঠাণ্ডা ধোঁয়া বেরোয়, তেমন ধোঁয়া বেরোচ্ছিল।

ওদিকে এগিয়ে যেতে যেতেই দুর্গা আমার কানে কানে বলল, ঋজুবাবু, তুমি বাবুর কথা শুনো না। সম্বরটাকে মেরে দাও। বহুদিন কাবাড়িরা এবং আমরাও পেটভরে মাংস খাই না। তুমি তো আজকাল শিকার করা ছেড়েই দিয়েছ। ও বাবু যা বলে বলুক, তুমি মেরে দাও। আমরা মজা করে খাই।

আমি জবাব না দিয়ে সম্বরটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

যতই এগোচ্ছিলাম, ততই আমার মনে একটা সন্দেহ দানা বাঁধছিল।

আর একটু এগোতেই, টিউলির হাতের আলোটা ভালো করে পড়তেই দেখলাম, সম্বরটার চোখ দুটো খুবলে খেয়ে নিয়েছে কুকুরগুলো। আগে যেখানে চোখ ছিল, এখন সেখানে দুটি গোলাকার রক্তাক্ত গর্ত। ঘন রক্ত গড়িয়ে পড়ছে চোখের কোটর থেকে। সম্বরটার পিঠের ও পেছনেরও অনেক জায়গায় খাব্‌লা খাব্‌লা মাংস তুলে নেওয়া হয়েছে। ও আসলে অন্ধ হয়ে গেছে। অজানিতে পথ না দেখতে পেয়ে নদীতে এসে পড়েছে। তারপর বেশী জলে এসে পড়ে হয়তো আর উঠতে পারছে না এ অবস্থায়।

দুর্গা অনবরত আমার কাছে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে চলেছে, মেরে দিন! ঋজুবাবু, মেরে দিন।

না মেরে উপায় ছিল না। রঘুবাবু যাই-ই বলুন না কেন—। এ সম্বরকে বন্দী করা গেলেও একে বাঁচানো যাবে না।

গোড়ালি সমান জলে দাঁড়িয়ে, ভালো করে ওর গলায় নিশানা নিয়ে যাতে ওর কষ্ট তাড়াতাড়ি লাঘব হয়, এমনিভাবে একটা গুলি করলাম। সফ্‌ট-নোজ্‌ড্‌ বুলেট ছিল, কাটা কলাগাছের মতো সম্বরটা ঝপাং করে জল ছিট্‌কে জলে পড়লো।

সম্বরটা পড়ে যেতেই কাবাড়িরা জ্বলন্ত কাঠ হাতে নিয়ে দৌড়ে এল এক সঙ্গে।

আমি উপরে উঠে এলাম।

রঘুবাবু তেমনিই হাত দুটো পিছনে রেখে দাঁড়িয়েছিলেন। মুখে কথা বলছিলেন না।

আমি ও'কে বুঝিয়ে বললাম যে, কেন আমার মারতেই হলো সম্বরটাকে।

রঘুবাবু তবু বললেন, না মারলেই পারতেন।

রঘুবাবুর স্বর রীতিমতন কঠিন শোনালো। উনি আমার সঙ্গে এমন বিরক্ত হয়ে কখনও কথা বলেননি আগে।

কোনো দোষ খুঁজে পেলাম না আমার। অনেক চেষ্টা করেও। ওছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।

রঘুবাবু তাঁবুর ভিতরে ঢুকে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে কাবাড়িরা ধরাধরি করে সম্বরটাকে এনে আগুনের পাশে রাখলো। যাতে কুকুরগুলো আবার ফিরে না আসে। কুকুরগুলো ফিরে এলেও আগুনের সামনে থেকে সম্বরটাকে ছোঁয়ার সাহস যে ওদের হবে না ওরা জানতো।

আমি তাঁবুর মধ্যে ঢুকে গেলাম। প্রায় আধঘণ্টা লাগলো পা আবার গরম হতে।

তাঁবুর মধ্যে শুয়ে পরিষ্কার যেন দেখতে পাচ্ছিলাম, কুকুরগুলো নালার ওপাশের জঙ্গলের আড়াল থেকে আগুনের সামনে রাখা সম্বরটাকে দেখছে। ওরা শুয়ে-বসে ওদের জিভ চাটছে। কত মাইল যে সম্বরটাকে ওরা তাড়া করে নিয়ে এসেছিল তা ওরাই জানে। ওদের মুখের গ্রাস থেকে ওদের বঞ্চিত করে মানুষরা যে কেন সম্বরটাকে তাদের খাদ্যে রূপান্তরিত করল ওদের সহজ পশুর বুদ্ধিতে ওরা তা বুঝতে পারছিল না।

ওদের খিদে পেয়েছিল। ঘামে ওদের সারা গা ভিজে গিয়েছিল। আগুনের আভায় ওদের চোখ জ্বলছিল, ওরা জিভ বের করে হ্যাঃ হ্যাঃ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল আর অভিশাপ দিচ্ছিল আমাদের।

সম্বরটা তাঁবুর কাছে এসে পড়েই যত গণ্ডগোল বাঁধালো। নইলে আমাদেরও কিছু বলার ছিলো না। জঙ্গলে স্বাভাবিক নিয়মে খাদ্য ও খাদক একই সঙ্গে থাকে। একজন অন্যজনকে খায় অন্যজন আরেকজনকে। এমনি করেই প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকে। মাঝ থেকে মানুষ এসে পড়েই এই স্বাভাবিক সাম্য নষ্ট করে।

তবে বুনো কুকুরের দলের মুখে মৃত্যু বড় যন্ত্রণার মৃত্যু। তিল তিল করে মৃত্যু। ভয়ার্ত, অন্ধ, আহত ও দিশেহারা সম্বরটার যন্ত্রণা থেকে যে ওকে একেবারে মুক্তি দেওয়া গেছে, এইটে ভেবেই মনটা একটু ভালো লাগছিল।

জিভ বের-করা বুনো কুকুরগুলোকে মনের চোখের সামনে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখেই একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে তাঁবুর বাইরে এসে দেখি, রঘুবাবু যে শুধু উঠেছেন, তাই নয়, মুখ ধুয়েছেন, প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নিয়েছেন, দাড়িও কামিয়েছেন. চান করেছেন, পুজো করেছেন, জলখাবার খেয়েছেন এবং পম্পাশর-এ যাওয়ার জন্যে তৈরীও হয়ে আছেন ইতিমধ্যেই জামা কাপড় পরে।

আমাকে দেখে উনি বললেন, জীপটা একটু নিয়ে যাব আমি, আমার জীপটা একটু গন্ডগোল করছে, মেহেরচাঁদকে বলেছি দেখে-টেখে ঠিকঠাক করে রাখবে। আমি বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসব।

বললাম, জীপ তো আপনারই, আমি তো চড়ছি শুধু।

উনি বললেন, এখন তো আপনারই। যতদিন আপনি থাকবেন, ততদিন এটা আপনারই।

তারপর বৃদ্ধ রঘুবাবু একটু হাসলেন। তাঁর সুগৌর শীর্ণ মুখে এক স্বর্গীয় হাসি ফুটে উঠল। বললেন, ব্যাপারটা কি জানেন? আমাদের মতো অনেক লোক সারাজীবন বাঁশ আর কাঠ কেটেই কাটিয়ে দিয়েছে। আমরা বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই নিজেদের স্বার্থে। পয়সা রোজগারের ফিকিরে। আপনি যে এখানে আসেন, তা শুধুই ভালোবাসার তাগিদে। চোখ কান তো ঠাকুর সবাইকেই দেন। চোখের ও কানের সম্ব্যবহার আমরা ক'জন করতে পারি? চোখ ভরে দেখুন, কান ভরে শুনুন, ভালো করে চিনুন জঙ্গলকে, তারপর যদি কখনও পারেন তো লিখুন এই কালিয়াদের কথা, এই সম্বরটার কথা, এখানের জীবন, এখানের সবকিছুর কথা।

তারপর একটু থেমে বললেন, জানেন, বড় সুন্দর আমাদের দেশটা। বড় ভালো আমাদের দেশের সাধারণ লোকগুলো। দুঃখের কথা এই-ই যে, আমাদের নেতারা কোরীয়াতে, এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে কি করে শান্তি আসে তা নিয়েই মাথা ঘামিয়েছেন, দেশের লোকদের কথা ভাবার সময় পাননি তাঁরা। বছরের পর বছর কেটেছে তাঁদের শুধুই ব্যালট-বক্সের দিকে চোখ রেখে।

অনেক কথা একসঙ্গে বলে ফেলে রঘুবাবু থামলেন।

বললেন, কিছু মনে করবেন না, বুড়ো হয়েছি তো। একটু বেশী কথা বলে ফেলি—আজকাল বড় ক্রিটিকাল, সীনিকাল হয়ে গেছি। বুড়ো হলে বোধহয় মানুষ এরকমই হয়ে যায়।

রঘুবাবু তাঁর গরম আলোয়ানটা কাঁধে ফেলে জীপের স্টীয়ারিংয়ে গিয়ে বসলেন। সত্তর বছরের বৃদ্ধ, সতেরো বছরের তরুণের মতো একগাল হেসে হাত তুললেন আমার দিকে, তারপর হটবাবুকে পাশে বসিয়ে নিজে জীপ চালিয়ে চলে গেলেন পম্পাশরে কালিয়ার গ্রামের দিকে।

মেহেরচাঁদ গাছতলায় বসে পেট্রলের বড় ড্রাম থেকে পেট্রল বের করে নিয়ে, জীপের প্লাগ পরিষ্কার করছিল পাট দিয়ে। ছুরি দিয়ে চেঁছে চেঁছে জমা কার্বন তুলছিল।

সেদিনের সেই খাটাস দেখে পালিয়ে আসার পর অবধি সে একটু মীইয়ে আছে।

কাবাড়িদের মধ্যে কে যেন ওকে উৎসাহিত করার জন্য বলল :

"মাচ্ছ খাইব ভাকুর, ঘইতা কইব ড্রাইভর
মাচ্ছ খাইব ইলিশী, ঘইতা কইব পুলিশী।"

মেহেরচাঁদ ওড়িয়া বোঝে, বলতেও পারে। ও মানে বুঝে হাসল।

গ্রামের মেয়েদের কাছে ড্রাইভার আর পুলিশ কনস্টেবল-এর মত প্রার্থীত স্বামী আর কিছুই নেই এখানে। একজন ট্রাকের ড্রাইভার এখানে টাটা-বিড়লার মত বড়লোক বলে গণ্য হয়। তাছাড়াও অতবড় দৈত্যের মত বুক-ধড়্ফরানো আওয়াজ-তোলা একটা যন্ত্রকে যে চালায়, এই বন-পাহাড়ের মেয়েদের কাছে সে তো দেবতা তুল্য। তাই এখানে এই ছড়াটা চলতি আছে। ছড়াটার মানে হল—

'মাছ খেলে খাব বোয়াল মাছ,
আর বিয়ে করলে করব ড্রাইভারকে।
মাছ খেলে খাব ইলিশ মাছ,
বিয়ে করলে করব পুলিশকে।

মেহেরচাঁদের শিকারে খুব উৎসাহ। কেবলি বলে, চলিয়ে না সাহাব, জেরা হিরন্ পিটাকে আঁয়ে। হিরন্ অর্থাৎ হরিণ খাওয়ার বড় শখ মেহেরচাঁদের।

সেই কাবাড়ি বলল, তোমার জন্যে বাবু এত বড় একটা সম্বর মেরে রাখলো, তাতেও হল না! তোমার হিরণ্ চাই? যাও না, কি রাঁধতে পারো, রাঁধো দেখি।

মেহেরচাঁদ হতাশ গলায় বলল, তোরা আবার খেতে জানিস নাকি? হয় ঝোল বানাবি, নয় নলা-পোড়া। কাবাব-টাবাব কিছুই তো বানাতে পারিস না তোরা। হতো আমার পাঞ্জাব তো দেখতি এই সম্বর দিয়ে বড়া কাবাব, গুলহার কাবাব, বটি কাবাব, শাম্মী কাবাব কেমন বানাতাম, আর রাত ভর ভাঙ্গরা নাচতাম—বলেই দু'হাত উপরে তুলে পায়ের পাতার উপর দাঁড়িয়ে একপাক ঘুরে গিয়েই সুর করে বলে উঠল, ও ব্বোলে, ব্বোলে, ব্বোলে, ব্বোলে...

সম্বরটাকে ওরা নদীর মধ্যে নিয়ে গেছে—ভাঁটিতে—যাতে আমাদের ডেরার সামনের জল নোংরা না হয়। বালিতে ফেলে সেটাকে কাটাকুটি হচ্ছে। গ্রামে যত লোক ছিল, সকলেই রাতের গুলির আওয়াজ শুনে আকাশ ফর্সা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এসে নদীর দু'ধারে শালপাতার দোনা নিয়ে বসে গেছে লাইন

দিয়ে। বেশীর ভাগই মেয়েরা।

এদিকে সম্বরটার চামড়া ছাড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তার কাল্‌চে-লাল চামড়া ছাড়ানো নগ্ন শরীরটা পড়ে আছে ধবধবে সাদা বালির ওপর। ওদিকে তাকালে গা ঘিন্‌ ঘিন্‌ করে।

দুর্গা লুঙি মুড়ে হাঁটু গেড়ে বসে সম্বরটার পেট ফাঁসিয়েছে ছুরি দিয়ে। তারপর তার বাহুমূল পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিয়ে পেটের নাড়িভুঁড়ি, পিলে-পট্‌কা সব টেনে টেনে বের করছে। গল্‌গল্‌ করে রক্ত বেরোচ্ছে—ঘন কালো রক্ত। পেটের মধ্যে নানারকম বায়বীয় ও তরলিমা শব্দ হচ্ছে। পেটটা চিরে ফেলার সংগে সংগে একটা দুর্গন্ধে আকাশ বাতাস ভরে গেল।

এক ঝাঁক শকুন আর পাহাড়ী বাজ ঠিক সময় খবর পেয়ে এসে গেছে। এসে নালার ওপারের গাছগুলোর ডালে ডালে বিরক্ত দর্শকের মত বসে আছে। দু'একটা সাহসী শকুন দু'এক পা করে এগিয়েও আসছে, তাদের লম্বা লম্বা বিদ্‌ঘুটে বিরল-লোম গলা নেড়ে নেড়ে। সংগে সংগে দুর্গা ও তার সাঙ্গো-পাঙ্গরা অশ্লীল গালাগালি করে উঠছে। হুস্‌স্‌ হুস্‌স্‌ করে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে শকুনগুলোকে।

সমস্ত জায়গাটার বালি রক্তে, নাড়িভুঁড়িতে লাল হয়ে গেছে।

তাঁবুর সামনের বড় পাথরে পা ঝুলিয়ে বসে ওদিকে চেয়েছিলাম। আলতো-চোখে। উদ্দেশ্যহীনভাবে।

হঠাৎ দেখলাম, দুর্গা হাত দিয়ে টেনে সম্বরটার পেটের ভিতর থেকে দুটি বেড়ালের সাইজের অপরিণত মৃত বাচ্চা বের করল এক-এক ঝট্‌কায়। পিছল পিছল দুটো লালচে রক্তমাখা বাচ্চা।

বের করতেই, মেয়েদের ভিড় থেকে একজন বুড়ি, "মন্ত্রে দিয়ন্তু, মন্ত্রে দিয়ন্তু" করতে করতে দৌড়ে এসে একটা বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিল দুর্গার কাছ থেকে।

ওরা সকলে বুড়িটাকে তেড়ে গেল। বুড়িটাকে ওরা সকলে বাইয়ানী, বাইয়ানী বলে ডাকছিল।

বাইয়ানী মানে পাগলী।

বুড়িটা বাচ্চাটাকে বুকে করে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল নদীর তটভূমি ধরে। দুর্গার এক অনুচর গিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে বালির মধ্যে ফেলে দিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে এসে সম্বরটার পাশে রাখল।

বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে উঠে এল বালি থেকে।

তার শনের মত চুল, কুঞ্চিত কপাল, ছিন্নভিন্ন রঙ-ওঠা শাড়ি, এবং তার

ঝুলে-পড়া কুঞ্চিত বুক সম্বরের গর্ভের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল।

বাইয়ানী কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসে আবার মেয়েদের মধ্যে বসল।

অন্যরা সকলে ওকে গালাগালি করতে লাগল।

ওদের প্রত্যেকের চোখমুখ দেখেই মনে হচ্ছিল যে মাংসের মত স্বাদু ও সার কোনো খাদ্যই ওদের কপালে জোটেনি বহুদিন। মাংসাশী জানোয়ারের মত মাংসলোলুপ হয়েছিল ওরা।

অথচ এখন কেউই ভাগ পাবে না। সম্বরটা পুরো কাটাকুটি শেষ হবে, তারপর দুর্গারা নিজেদের জন্যে সিংহভাগ রাখবে। তারপর সমান ভাগে ভাগ হবে বাদবাকী মাংস অসংখ্য ভাগে। এক এক করে মেয়েরা শালপাতার দোনা নিয়ে এগিয়ে আসবে, আর দুর্গারা এক এক ভাগ তুলে দেবে ওদের প্রত্যেকের হাতে।

ওরা সেই মাংস নিয়ে বাড়ি যাবে। তারপর কোর্মা নয়, কাবাব নয়, স্রেফ জলের মধ্যে সেদ্ধ করে অথবা আগুনে ঝলসে নুন দিয়ে কামড়ে কামড়ে সেই আণ্ডারডান্ মাংস খাবে। তখন ওদের চোখমুখ দেখলে মনেই হবে না, ওরা বিংশ শতাব্দীর মানুষ। মনে হবে, ওরা সব প্রাগৈতিহাসিক গুহামানবী।

ওদের প্রায় সমস্ত জানোয়ারের মাংসই খেতে দেখা যায়। এমন কি বাইসনের মত শক্ত পেশীর জানোয়ারের মাংসও ওরা কাড়াকাড়ি করে খায়। বাইসনকে ওরা বলে গল্ব। কোথাও গল্ব শিকার হলে শ'য়ে শ'য়ে মেয়ে-পুরুষ এসে জোটে পাঁচ-দশ মাইল দূর দূর থেকে হেঁটে।

ওরা বাঘের মাংসও খেতে ছাড়ে না। খায় বলা ঠিক নয়, চোষে বলা ভালো। কারণ একমাত্র পেট ছাড়া বাঘের শরীরে মাংস বলতে বা চর্বি বলতে আমরা যা বুঝি তা বিশেষ কোথাওই থাকে না। যা থাকে, তা কাল্‌চে লাল দড়ির মত পাকানো পাকানো পেশী। সেই পেশী সহজে সেদ্ধও হয় না, কেউ খেতেও পারে না তা। নাগারা এবং অনেক আদিবাসীরা খায়। সেদ্ধ করতে চাইলে রাবারের মত হয়ে যায়। ওরা তবু ছাড়ে না। ওদের দাঁত লাফিয়ে ওঠে। তবু ওরা কামড়াতে থাকে।

মাংস কাটা হয়ে যাবে, ভাগ হয়ে যাবে, কিছুই পড়ে থাকবে না—এমন কি নাড়িভুঁড়ি, হাতপায়ের ক্ষুর সবই ছিনিয়ে নেবে ওরা। চামড়াটা ডেরার কাছে নুন লাগিয়ে শুকুতে দেওয়া হবে কোনো পাথরের উপর। লোকজন চলে গেলে, শকুনিগুলো এক পা এক পা করে এগিয়ে এসে যেখানে সম্বরটাকে কাটা হয়েছিল সেখানে এসে দাঁড়াবে। তারপর ওদের লম্বা লম্বা গলা তুলে মানুষ নামক বুভুক্ষু, সর্বগ্রাসী জন্তুগুলোকে অভিসম্পাত দেবে। তারপর

একে একে আবার উড়ে যাবে। আবার ছোট ছোট কালো বিন্দুর মত ঘুরে ঘুরে উড়বে নীল আকাশে অন্য কোনো পূতিগন্ধময় মৃতদেহের জন্যে। রাত হয়ে গেলে রক্তের গন্ধ পেয়ে হায়না আসবে। জায়গাটাকে শুঁকে চলে যাবে। মাঝরাতে তার হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ বুক কাঁপানো হাসিতে ডেরার সকলের ঘুম চটে যাবে।

বেশ বেলা হয়ে গেছে। এখনও নদীর মধ্যে ক্ষুধাতুর মাংসলোলুপ মেয়ে-গুলোর কামড়াকামড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে একপাল মাদী-শিয়াল মিলন-মাসে শোর তুলেছে। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগে না। মন খারাপ লাগে। কিরকম অপরাধবোধ জাগে।

চান করতে যাব ভাবছি বোষ্টম নালায়, এমন সময় একজন ফরেস্ট গার্ড সাইকেল চড়ে এল। বলল, ডি. এফ. ও. সাহেব এসেছেন। আপনাকে খবর দিতে বললেন। উনি বাংলোতে আছেন।

আমি বললাম, তোমার সাইকেলের ক্যারীয়ারে বসি?

ও বিশ্বাস করল না। ভাবল ঠাট্টা করছি। বলল, আপনি তো জীপে আসবেন।

বললাম, আজ জীপ নেই। তারপর ওর ক্যারীয়ারে বসে ফরেস্ট বাংলোয় এলাম।

দেখলাম বারান্দায় খুব ভীড়। ডি. এফ. ও. সাহেব এসেছেন—তাই এ অঞ্চলের নানা জায়গায় রেঞ্জাররা এসে জুটেছেন।

এই ডি. এফ. ও. সাহেব খুব উৎসাহী লোক ছিলেন। জঙ্গলকে সত্যি সত্যি ভালোবাসতেন উনি।

বাংলোয় পৌঁছতেই বললেন, ঋজুবাবু, আপনি এদের সঙ্গে গেলে ভালো হয়।

শুধোলাম, ব্যাপার কি?

উনি বললেন, আগে চা খান, তারপর বলছি।

চা খাওয়া হলে, উনি বললেন, এক সার্কাস কোম্পানী একটি বাচ্চা হাতী ধরার পারমিশান নিয়ে এসেছেন। ওঁরা বলছেন, খেদা না করে, পোষা হাতীর কোনোরকম সাহায্য না নিয়েই ওঁরা হাতী ধরবেন। আমি বলে দিয়েছি, রাইফেল-টাইফেল নিয়ে যাওয়া চলবে না। শেষে বাচ্চা হাতী ধরতে এসে আমার জঙ্গলের হাতীদের আহত করে কি মেরে চলে যাবেন এঁরা, সেটি হচ্ছে না।

সার্কাসের দলের লোক সবিনয়ে বললেন, না আজ্ঞে, তা কখনও করি?

ডি. এফ. ও. সাহেব আমাকে বললেন, আপনি যদি আমার রিপ্রেজেন্‌টেটিভ হয়ে ওদের সঙ্গে যান, তাহলে খুব ভালো হয়, আমার আজই বৌধে যেতে হবে কাজে। অবশ্য আপনার সঙ্গে রেঞ্জার সাহেব, ফরেস্ট গার্ড এ'রা সবাই-ই থাকবেন।

আমি রাজী হলাম। কিন্তু বললাম, কোনো আয়োজন না করে, খেদা না করে, কি করে দলের মধ্যে থেকে হাতীর বাচ্চা ধরা যাবে তা তো আমি বুঝতে পারছি না।

সার্কাস কোম্পানীর প্রতিনিধি বললেন, সে আপনি দেখতেই পাবেন। আমি ধরলেই তো হল। দেখবেন, যখন ধরে ট্রাকে তুলে নিয়ে যাব কটক, তখন নিজের চোখেই তো দেখতে পাবেন।

ভদ্রলোক এত নিশ্চিন্তভাবে যখন কথাটা বললেন, বুঝলাম যে নিশ্চয়ই কোনো গুপ্তবিদ্যা জানা আছে।

ডি. এফ. ও. সাহেব আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, মশাই, আমারও কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। মনটা ভালো লাগছে না। তাই-ই তো আপনাকে খবর দিলাম। আপনার কাছে পরে এই গুপ্তবিদ্যাটা জানা যাবে—আগে আপনি তো জানুন।

এই বলে ডি. এফ. ও. সাহেব জীপ নিয়ে চলে গেলেন বৌধে।

আমি শুধোলাম, আপনারা কি এক্ষুনি বেরোবেন?

সার্কাস কোম্পানীর লোক প্রায় আমাকে ধম্‌কে বললেন, তবে না তো কি?

বললাম, চান-খাওয়া যে হয়নি এখনও। কতক্ষণে ফিরতে পারবেন?

ভদ্রলোক বিদ্রুপের গলায় বললেন, সে তো আমাদেরও কারোই হয়নি। যাব আর আসব—এই আর কি। কতক্ষণেরই বা ব্যাপার।

রেঞ্জারবাবু, ফরেস্টারবাবু, দু'জন ফরেস্ট গার্ড, সবাই-ই চললেন সঙ্গে। তার উপর ওদের প্রায় জনা কুড়ি লোক ট্রাকের মাথায় দড়ি-টড়ি বাঁশ-টাশ সমেত।

বেরোবার আগে ফরেস্টারবাবু আর রেঞ্জারবাবুর মধ্যে কি সব ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা হল। পরমুহূর্তেই একজন ফরেস্ট গার্ড চলে গেল তার বাড়িতে। তারপর ফিরে এল তার গাদা বন্দুকটা নিয়ে।

রেঞ্জার বললেন. যাই বলুন ঋজুবাবু, এদের ভাবগতিক ভালো লাগছে না। একেবারে খালি হাতে গিয়ে কি প্রাণে মরব? আমার আবার পায়ে আর্থারাইটিস্‌। গাছে চড়তে পারি না। দৌড়তেও কষ্ট হয়। বড় সাহেব যাই-ই বলুন। ফিরে এসে জবাবদিহি করব।

আমারও ঐ কথাটা মনে হচ্ছিল। কিন্তু অত লোক সাহস করে যাচ্ছে খালি হাতে, তার মধ্যে আমি একাই ভয় পেয়েছি এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা করছিল।

রেঞ্জারবাবু হঠাৎ নিজের মনেই বললেন, আরে, পঁচিশজন মানুষের সাহস যোগ করলে কি একটা হাতীর সাহসের সমান হবে না?

অতএব অস্নাত, অভুক্ত আমরা সকলে, বেলা দশটা নাগাদ ট্রাকে করে সার্কাস কোম্পানীর লোকেদের সঙ্গে সার্কাস করতে করতে রওয়ানা হলাম বাঘমুণ্ডার দিকে, জগন্নাথপুরের দিকের রাস্তা দিয়ে।

ট্রাক যতদূর যেতে পারে গেল।

তারপর ট্রাক থেকে নেমে আমরা পঁচিশজন বীরপুরুষ একটা ভীতু হাতীর বাচ্চাকে ধরবার জন্যে এগোতে লাগলাম।

আমি কিন্তু বীরপুরুষ নই। বাঘ ডাকলে, হাতী শুঁড় তুলে চীৎকার করলে আমার সত্যিই ভয় করে। ছোটবেলাতেও করত; আজও করে। তার উপরে একেবারে খালি হাতে। তাই সকলের পেছন পেছন চললাম।

হাঁটতে হাঁটতে ভেবে পাচ্ছিলাম না এ লোকটা হাতীর দলের মধ্যে থেকে কি করে বাচ্চা ধরবে। কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না।

রেঞ্জার সাহেব ফরেস্ট গার্ডকে ডেকে তার বন্দুকটা গেদে নিতে বললেন। বললেন, খুব বেশী করে বারুদ গাদো। তারপর সবচেয়ে বড় গুলি লাগাও।

কথামত ফরেস্ট গার্ড গাণ্ডে-পিণ্ডে গাদাগাদি করে বন্দুক গাদলেন। ক্যাপ লাগালেন ঘোড়ার নীচে। তারপর ইয়াব্বড়া এক গোল সীসের বল গাদলেন শেষে।

জঙ্গল আস্তে আস্তে গভীর হয়ে আসছিল। এখন প্রায় দিনের আলো ঢোকে না এমন জঙ্গলে ঢুকে গেছি আমরা।

হাতীর চিহ্ন দেখে দেখেই এগোচ্ছিল লোকটি।

বেশ অনেকখানি হরজাই জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে গিয়ে এক গভীর বাঁশের জঙ্গলের সীমান্তে এসে যেই প্রথমবার হাতীর দলের আওয়াজ পেলাম—তখনই বুঝলাম যে, লোকটা তাহলে বুজরুক নয়। এত সহজে, এত তাড়াতাড়ি যে সোজা হাতীর দলের কাছে নিজের দল নিয়ে এসে পৌঁছতে পারে, তার পক্ষে গুপ্তবিদ্যা জানাটাও আশ্চর্য নয়।

হাতীগুলো পাহাড়ের নীচের বাঁশের জঙ্গলে কচি কচি বাঁশ ভেঙে খাচ্ছিল।

রণক্ষেত্রে পৌঁছে আমরা যারা নিরস্ত্র দর্শক তারা স্বাভাবিক কারণে পিছিয়ে পড়লাম। কিন্তু রেঞ্জার সাহেব সরকারী কর্মচারী এবং তদুপরি

বর্তমান সমাবেশে সর্বোচ্চ পদাধিকারী। তাই তাঁকে সার্কাস কোম্পানীর মাতব্বরের সঙ্গেই থাকতে হলো। কিন্তু তিনি বন্দুকধারী গার্ডকে পাশে পাশে সর্বক্ষণ নিয়ে চললেন। বললেন, খবরদার! বিনা কারণে গুলিগোলা ছুঁড়বি না।

গার্ড বেচারা একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। সে কোন্ কারণে এবং কতখানি সিরিয়াস কারণে গোলাগুলি ছুঁড়বে তা বুঝতে পাচ্ছিল না। তাছাড়া একনলা গাদা বন্দুকে গুলি তো একটাই। গোলাগুলির প্রশ্নই ওঠে না।

কিছুদূর যাবার পরই দলটার খুব কাছাকাছি পেঁাছে গেলাম আমরা।

সামনে তাকিয়ে দেখলাম সার্কাস কোম্পানীর মাতব্বর বুক ফুলিয়ে আরো এগিয়ে চলেছে সামনে।

দলে মাত্র একটিই বাচ্চা হাতী ছিল, বাচ্চা মানে, সবে মায়ের দুধ-ছাড়া বাচ্চা। বাচ্চাটা এ হাতীর পায়ের মধ্যে দিয়ে গলে গিয়ে অন্যজনের পায়ের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। দলের মন্দাটা প্রকাণ্ড দাঁতাল। একটা দাঁতাল সর্দার আর তিন-চারটি মাদী হাতী ছিল ঐখানে বাচ্চাটা সমেত। দলের অন্যান্যরা বোধহয় পাহাড়ের ওপারে চরছিল।

কেন যেন আমার ভয় ভয় করতে লাগল। মনের মধ্যে একটা 'কু' ডাক দিতে লাগল। কিন্তু কি ঘটে সেটা দেখার লোভও সামলাতে পারছিলাম না।

তাড়াতাড়িতে জুতো খুলে আমি একটা খুব বড় তেঁতরা গাছে তরতরিয়ে শাখামৃগর মত উঠে গেলাম। যখন একটা গ্রাণ্ড স্ট্যাণ্ড ভিউ পাওয়ার মত ডালে আরাম করে বসেছি, তখন হঠাৎ সর্দার দাঁতাল এদিকে ঘুরে শুঁড় তুলে প্যাঁ-এ-এ-এ করে ডাকল।

চারধারে চেয়ে দেখি—উপভোগ্য এক দৃশ্য! দাঁতালের ঐ এক বৃংহণেই সার্কাস কোম্পানীর বেশীর ভাগ লোক সার্কাস করতে করতে চতুর্দিকের গাছে চড়াও হয়েছে। যে-গাছে তাকাই, সে গাছেই মানুষ। বাঁদরদের এ জঙ্গল থেকে উদ্বাস্তু করে আমরা জঙ্গল জাঁকিয়ে জমজমাট হয়ে বসেছিলাম।

সার্কাসের সেই মাতব্বরের কিন্তু তখনও ডোণ্ট-কেয়ার ভাব। তার সঙ্গে আরও দু'জন সাহসী অনুচর। পিছনে রেঞ্জার সাহেব ও তাঁর বডি গার্ড।

কোঁচর থেকে আছাড়ি-পটকা নিয়ে মাতব্বর চতুর্দিকে আছড়ে মারতে লাগলেন। তাতে হাতীগুলো একটু ভয় পেয়ে পাহাড় চড়তে শুরু করল দৌড়ে দৌড়ে। বাচ্চাটা সামান্য পেছিয়ে পড়ল। আর অমনি মাতব্বর এক দৌড়ে গিয়ে তার গলায় সাদা-রঙা নাইলনের দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিল। ভদ্রলোকের যে সাহস আছে, তা আমাদের প্রত্যেকেরই স্বীকার করতে হল। নেহাত

হাত ছেড়ে দিলে ডাল থেকে পড়ে যেতাম, নইলে আমি হাততালিও দিতাম।

বাচ্চাটার গলায় মোটা দড়ির ফাঁস লাগাতেই মাতব্বর ও তার অনুচরদ্বয় দড়ি ধরে "হেঁইয়ো" বলে টান লাগাল। এবং এক হাতে দড়ি ধরে অন্য হাতে মুহুর্মুহু আছাড়ি-পটকা ফাটাতে লাগল।

বাচ্চাটা টানাটানিতে বেশ কয়েক গজ এদিকে চলেও এল। কিন্তু পরক্ষণেই "পাদমেকং ন গচ্ছামি" বলে মাটিতে সে জেদী মেয়ের মত থেবড়ে বসে পড়ল। বাচ্চা হলেও, হাতীরই তো বাচ্চা—তার ওজন কম নয়।

সেই অধঃপতিত অবস্থা থেকে তাকে উত্থিত করার চেষ্টায় গলার দড়িতে প্রচণ্ড টান লাগানো হল। আর অমনি বাচ্চাটা চেঁচিয়ে উঠল অদ্ভুত একটা সংক্ষিপ্ত আওয়াজ করে।

রেঞ্জার সাহেব যুদ্ধে জিত হয়ে গেছে ভেবে বটুয়া থেকে পান বের করে গুণ্ডি সহযোগে তা খাচ্ছিলেন এবং বৃক্ষারূঢ় আমাদের সাহসের অভাবের কথা ভাবছিলেন।

এমন সময় বাচ্চার গলা শুনে বাচ্চার মা ঘুরে দাঁড়িয়ে পাহাড় জঙ্গল ভেঙ্গে দৌড়ে আসতে লাগল।

হাতীকে জঙ্গলের মধ্যে চার পা তুলে যাঁরা দৌড়তে না দেখেছেন তাঁরা অনুমানও করতে পারবেন না যে, হাতী কত জোরে দৌড়তে পারে। হাতীর দৌড়ের ভঙ্গীটা খুব হাস্যকর।

সেই মাদী হাতীটা বেগে পাহাড় বেয়ে নেমে আসছিল।

সার্কাসের মাতব্বর সমানে তখনও আছাড়ি-পটকা আছড়ে যাচ্ছেন। কিন্তু গাছ থেকে হাতীটাকে দেখে আমার মনে হল যে, তখন অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক গান দিয়েও তাকে থামানো যাবে না—। আছাড়ি-পটকা তো দূরস্থান।

মাতব্বর শেষ পর্যন্ত দড়ি ধরে দাঁড়িয়েছিল। রেঞ্জার সাহেব ততক্ষণে সার্কাসওয়ালার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। উনিও তার প্রায় গায়ে লেগে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হাতীটা প্রায় এসে পড়েছে, যখন একবারে কাছে এসে পড়েছে, তখন হঠাৎ সেই মাতব্বর অমনি মিলকা সিংকেও লজ্জা দিয়ে এমন জোরে দৌড় লাগালেন দড়িটড়ি ফেলে যে, তা বলার নয়।

কিন্তু রেঞ্জার সাহেব মিলকা সিং নন। তার উপর তাঁর পায়ে আর্থারাইটিস্। সেই মাতব্বরের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল হতে না হতে হাতীটা প্রায় তাঁর উপর এসে পড়ল। তখন বাচ্চাটাকে পিছনে ফেলে হাতীটা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিহিংসার জন্যে। তার উৎক্ষিপ্ত গোলাকার শুঁড়

একটুর জন্যে রেঞ্জার সাহেবের মাথা ফস্‌কে গেল।

আমরা রেঞ্জার সাহেবের ভয়ার্ত গলা শুনলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ত গার্ড প্রায় হাতীর কানে গাদা-বন্দুকের নল ঠেকিয়ে গুলি করল।

গুলির শব্দ রেঞ্জার সাহেব আর ফরেস্ট গার্ডের পালিয়ে যাবার শব্দের সঙ্গে মিশে গেল।

আমরা কেউ তারপর যা ঘটল তার জন্যে একেবারেই তৈরী ছিলাম না।

বাচ্চার মা-হাতীটা কয়েক সেকেন্ড একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। তার শরীরটা টলতে লাগল। তারপর অতবড় হাতীটা আস্তে আস্তে বসে পড়ল মাটিতে। হাতীটা বার বার মাটি ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু পারল না। কিছুতেই পারল না। কিছুক্ষণ শরীরের মাংসপেশীগুলো নড়ল। পা'গুলো একটু নড়ল। তারপর সব স্থির হয়ে গেল।

একটু পর বাঁ কানের ফুটো দিয়ে কালচে রক্ত গড়িয়ে আসতে দেখা গেল বাইরে।

ইতিমধ্যে মন্দা দাঁতাল হাতীটা ফিরে এসেছে। এসেই সে রেঞ্জার সাহেবদের দিকে অনেকখানি ধেয়ে গেল। তারপর ফিরে এল মাদী হাতীটার কাছে।

আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসেছিলাম।

একটা মূর্খ বাহাদুরীপ্রবণ লোকের বাড়াবাড়ির জন্যে যে এক্ষুনি একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল চোখের সামনে, এক্ষুনি যে দু'জন মানুষের মৃত্যু আমাদের দেখতে হতো, একথা ভেবে ঐ মাতব্বরকে ধরে আমার চাব্‌কাতে ইচ্ছে করছিল।

বেচারী ডি. এফ. ও. সাহেব। এত চেষ্টা করেও তিনি তাঁর জংগলের একটি হাতীর মৃত্যু রোধ করতে পারলেন না।

আমরা চুপ করে বসেছিলাম। নিষ্কম্প হয়ে।

দাঁতাল হাতীটা যেন বিশ্বাস করল না যে, তার সঙ্গিনী মরে গেছে।

বাচ্চাটা এসে তার মায়ের পেটের কাছে ঘুরতে লাগল। তখনো তার গলায় দড়ির সেই ফাঁসটা লেগে ছিল। ঐ ফাঁস মানুষের লাগানো। মানুষ ছাড়া আর কেউ ও ফাঁস খুলতে পারবে না। ও যেখানেই যাচ্ছিল গলার সঙ্গে বাঁধা দড়িটা সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল পিছন পিছন। যদি এ বাচ্চাটা বড় হয়, এ দড়িটা যতদিন না ঝড়ে-জলে ধুলোয় ক্ষয়ে যায়, ছিঁড়ে যায়, ততদিন ওর গলাতে ওটা কেটেই বসে থাকবে।

মন্দা দাঁতালটা মাদী হাতীটার চার পাশে ঘুরল বার বার। তার প্রকাণ্ড দাঁত দিয়ে ওকে ওঠাবার, দাঁড় করাবার চেষ্টা করল। তাতেও যখন সঙ্গিনী

কথা বলল না, নড়ল না চড়ল না, তখন সে এক আশ্চর্য কাণ্ড করল। তার প্রকাণ্ড লিঙ্গ উদ্যত করে সে পেছন থেকে হস্তিনীর যোনি স্পর্শ করল। অনেক চেষ্টা করল সঙ্গিনীর ঘুম ভাঙাতে। বারবার চেষ্টা করল।

এতেও যখন হস্তিনী সাড়া দিল না, তখন হঠাৎ যেন দাঁতাল হাতী ক্ষেপে গেল। ক্ষেপে গিয়ে দূর থেকে এক দৌড়ে এসে দুটো দাঁতই ঢুকিয়ে দিল শায়িতা হস্তিনীর পেটে। নদ্ নদ্ শব্দ করে ভস্‌স্ আওয়াজে দুর্গন্ধ সমেত হাতীর কয়েক মণ নাড়িভুঁড়ি সব মাটিতে নেমে এল। অত বড় বড় দাঁতে প্রায় পুরো পেটটাই ফেঁসে গেল হস্তিনীর।

হাতীটা কেন এমন করল তা বলার মত আমার জ্ঞান ছিল না; আজও নেই। কিন্তু দেখলাম সে করল।

তারপর মা-হারা বাচ্চাটাকে, গলায় সভ্য মানুষের উপহারের দড়ি-বাঁধা অবস্থায় পায়ে পায়ে নিয়ে, দাঁতাল সর্দার ধীর পায়ে পাহাড় পেরিয়ে, সঙ্গিনীর দিকে আর একবারও পিছন ফিরে না চেয়ে, ওদিকের উপত্যকায় তার দলের সঙ্গে মিলিত হতে গেল।

পাহাড়ের নীচে ছায়া ঘন হয়ে এসেছিল। দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল হতে চলল। কিন্তু গাছ থেকে নামার কথা কারোই মনে হচ্ছিল না। ঘটনা পরম্পরার অভাবনীয়তায় ও বীভৎসতায় আমার সমস্ত বোধ ভোঁতা হয়ে ছিল।

দাঁতাল হাতী বাচ্চাটাকে নিয়ে চলে যাবার প্রায় আধঘন্টা পর গাছ থেকে নামলাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ী বাজ আর শকুনরাও এসে নামল আকাশ থেকে। ওদের চোখে কিছুই অদেখা থাকে না। জঙ্গলের গভীরে যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, উপরেব পাতার চন্দ্রাতপে যদি কিছুমাত্র ফাঁক থাকে, তা হলে তা এদের নজর এড়ায় না।

বেচারী হাতী-মা। ওর একমাত্র অপরাধ এই-ই ছিল যে তার বাচ্চাকে সে ভালোবাসতো। একটা প্রাণহীন নিস্তব্ধ কালো টিলার মতো সে গভীর সবুজ জঙ্গলের মধ্যে স্থির হয়ে পড়ে রইল। সে আর কখনও উঠবে না।

পাহাড়ের ওপারে ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে মধ্যে তার আদরের বাচ্চাটা এতক্ষণ তার দলের সঙ্গে কোনো গভীরতর জঙ্গলের নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল। যেখানে মানুষের নোংরা পা পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

॥ ৩ ॥

আজ সকালেই শ্যামলবাবু খবর পাঠিয়েছিলেন যেন রাতে ওঁর ওখানে খিচুড়ি খাই আর শুয়োর মারার জন্যে বসি।

সন্ধ্যের পর রাইফেল কাঁধে নিয়ে গরম কাপড়-জামা আর একটা কম্বল কাঁধে ফেলে রওয়ানা হলাম শ্যামলবাবুর তৈলার দিকে।

ঘোর অন্ধকার চতুর্দিকে। ঝিঁঝিদের একটানা ডাকে অন্ধকারটা যেন চারিয়ে উঠছে। পথের পাশের মিট্কুনিয়া গাছ থেকে একটা বড় প্যাঁচা দুরগুম্-দুরগুম্-দুরগুম্ করে উঠল। বাঘমুণ্ডার দিক থেকে হাতীর বৃংহণ শোনা গেল।—দূরের মার্সিডিস ট্রাকের হর্নের আওয়াজের মতন। বোষ্টমনালার কজওয়ের সামনে এক ঝাঁক চিতল হরিণ দৌড়ে রাস্তা পার হল ডানদিক থেকে বাঁদিকে। শিঙাল হরিণটা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ে এদিকে মুখ ঘুরিয়ে ডাকতে লাগল। টাঁউ-টাঁউ-টাঁউ।

শ্যামলবাবুর তৈলায় পৌঁছনোর আগে থেকেই তাল-পট্কার আওয়াজ শোনা যেতে লাগল মাঝে-মাঝে। ওঁরা প্রায় পনেরো মিনিট পর পর তাল-পট্কা ফাটাচ্ছিলেন জানোয়ারদের ভয় পাওয়াবার জন্যে।

তৈলা মানে, জঙ্গলের বুক থেকে ছিনিয়ে নেওয়া চাষের জমি। একসারি মাটির ঘর—খড়ের ছাউনি দেওয়া। একপাশে মাটির বারান্দা। একটা ঘরে রান্না হয় একটা ঘরে মুহুরীরা শোয়, একটা ঘর অনিবাবুর। অন্য ঘরে শ্যামলবাবু থাকেন।

শ্যামলবাবুর ঘরের মধ্যে লণ্ঠন জ্বলছিল বাঁশের মাচার উপর। মাটির দেওয়ালে দুটি পেরেক পোঁতা—তাতে দড়ি টানানো—তার উপরে জামাকাপড় ঝোলানো। মাটির কলসীতে পানীয় জল। মাচার উপরে শ্যামলবাবুর বিছানা পাতা। দেওয়ালে মদের কোম্পানীর বুক-দেখানো উরু-দেখানো মেয়ের ছবি-ওয়ালা গরম ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। এক কোণে ওঁর সাইকেলটা ঠেস্ দিয়ে দাঁড় করানো। লণ্ঠনের আলো ক্রোমিয়াম-প্লেটিং করা হ্যাণ্ডেলে চক্চক্ করছে।

শ্যামলবাবু উদ্বাহু অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, চা খাবেন নাকি এক কাপ? রান্নার এখনও দেরী আছে।

তারপর বললেন, চলুন, বারান্দায় বসি, চেয়ারে।

বারান্দায় বসে ডালের বড়া দিয়ে চা খেতে খেতে অনেক গল্প হল শ্যামলবাবুর সঙ্গে।

শুধোলাম, অনিবাবু কোথায়? তাঁকে দেখছি না যে।

শ্যামলবাবু বললেন, উনি একটু টিকরপাড়া গেছেন চা বিক্রী করতে। যদি মাছ পান তো নিয়ে আসবেন। আনলে, কাল মাছ পাঠাবো আপনাকে।

আজ রাতে বোধহয় বৃষ্টি হবে। আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে। সব তারাদের দেখা যাচ্ছে না। শুধু কালপুরুষকে দেখা যাচ্ছে। কোমরে তরোয়াল ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অতন্দ্র প্রহরী। ঝুরুঝুরু করে একটা হাওয়া দিচ্ছে থেমে থেমে। হাওয়ায় দূরাগত শীতের বৃষ্টির গন্ধ। বাঁশবনে কট্‌কটি আওয়াজ উঠছে। তক্ষক ডাকছে থেকে থেকে। কট্‌কটে ব্যাঙ পাথরের নীচ থেকে বৃষ্টির আভাস পেয়ে ডেকে উঠেছে কটর্‌ কটর্‌ করে। সমস্ত জঙ্গল প্রকৃতির স্বগতোক্তিতে ভরে গেছে।

পাশের ঘরে মুহুরীদের মধ্যে কে যেন একটা ঢোল বাজিয়ে গান গাইছে। গানটার সুরটা ভারী মিষ্টি।

আমি শুধোলাম, কে গাইছে গান? ডাকুন না শোনা যাক।

শ্যামলবাবু হাসলেন, বললেন, আমার মুহুরীদের রস তো কম নয়। সারাদিন খাটেপেটে, সন্ধ্যের পর গান বাজনা হয়। শুনতে পাই, যখন আমি থাকি না, তৈলার মধ্যে সারারাত ক্যাবারে হয়। সব শালা হারামী। আমি না থাকলেই সাপের পাঁচ পা দেখে।

আমি হেসে উঠলাম। বললাম, ক্যাবারে হয় মানে?

শ্যামলবাবু তাচ্ছিল্যের গলায় বললেন, কোনো মেয়েকে নিয়ে আসে আশ-পাশের গ্রাম থেকে আট-আনা একটাকা দিয়ে—সকলে মিলে পানমৌরী খায়—তারপর এরা মাদল পেটে, গান গায় আর সে উদোম হয়ে আগুনের চারধারে ঘুরে ঘুরে সারারাত নাচে। এই জঙ্গলে পাহাড়ে এদের তো কোনো রিক্রিয়েশান নেই। একটানা ন'মাস, এক বর্ষার সময় ছাড়া এরা ঘর-সংসার ছেড়ে জঙ্গলেই কাটায়। সিনেমা নেই, থিয়েটার নেই, লেখাপড়া জানে না যে বই পড়বে, আর জানেও বা যদি, তো বই কোথায়? এইসব নিয়েই থাকে। সময় কাটায়।

আমি বললাম, আপনার মুহুরীরা সকলেই তো কাগজপত্র নিয়ে কি সব লেখালেখি করে দেখি। লেখাপড়া জানে না কিরকম?

শ্যামলবাবু জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, ও লেখাপড়া কাঠের হিসাব। কত গাছ মার্কা হল, কত বর্গফুট কাঠ কাটা হল, গাদা-দেওয়া রইল কত

বর্গফুট, লরীতে চালান হল কত, এই সব হিসেব। ঐ অংকটাই জানে ওরা, কাঠের অংক। তবে হ্যাঁ। এদের মধ্যে একজন কবিও আছে। যে গান শুনছিলেন, তা সেই কবির স্বরচিত গান।

বললাম, বলেন কি? ডাকুন ডাকুন, কবির শ্রীমুখে তার স্বরচিত গান শোনা যাক।

শ্যামলবাবু ডাকতেই ওরা সদলে এল।

কিন্তু আমাকে দেখে লজ্জায় কাঁচুমাচু হয়ে রইল। কিছুতেই গান গাইতে চাইল না। শেষে অনেক পীড়াপীড়িতে কবি গানটা গাইল :

"লহ লহ লহ মারিস
কন্ট দেই করি কিম্পা না আস।—প্রেমিকা

তম ঘরে যেয়ুঁ কালিয়া কুকুর
কাটি খাউথেলা মোর মাংস।—প্রেমিক

লম্বা লাঞ্জিয়া পুতুকা মুহ
কার্য ভাঙিলু মোর
যেব্বে আস্বিব ভাদ্রব মাস
পেট ছান্দিবি তোর।—প্রেমিকা

নই নই আসে, ছপি ছপি আসে
মুই ভাব থাই চোর
তোর সঙ্গে যেব্বে ভাব পীরতী
লাঞ্জ মারি যাউ মোর॥—প্রেমিকার কুকুর

গানটির সুর যেমন মিষ্টি, তেমনি কবির গলার স্বর, তেমন ওরিজিনাল কথা। গানটির একটু ব্যাখ্যা দরকার।

জঙ্গলের মধ্যে প্রেমিকার ছোট্ট কুঁড়ে। কুঁড়ের সামনে দিয়ে নালা বয়ে চলেছে। আদুল-গায়ে লাল শাড়ি পরা প্রেমিকা তার গোবর-লেপা আঙিনায় ঘোরে ফেরে, ঘর গেরস্থালির কাজ করে, হাওয়ায় হাওয়ায় হলুদ বাঁশপাতা, সাদা সাদা শালের ফুল উড়ে এসে পড়ে আঙিনায়, তার নতুন যৌবনে দোলা লাগে, চল্‌কে চল্‌কে ওঠে তার উপচীয়মান বুক, চমক লাগে তার নিভৃত নিতম্বে; গুনগুনিয়ে গান গায় সে।

কথা ছিল যে, সন্ধ্যার কোনো এক যামে তার প্রেমিক আসবে তার কাছে।

ভালো করে চান করেছিল সে ছায়াচ্ছন্ন নালার বহমান জলে সাজিমাটি দিয়ে, নিমতেল মেখেছিল তার কোমর সমান জঙ্গলের গন্ধ-ভরা চুলে, করৌঞ্জের তেল মেখেছিল সে মুখে, প্রদীপের আলোয় কাজল তুলে সে কাজল পরেছিল চোখে, চন্দনের গুঁড়ো মেখেছিল সারা গায়ে। সে তার সমস্ত শরীর ও যুবতী মনের সুখকর যন্ত্রণা নিয়ে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছিল প্রেমিকের। কিন্তু সময় মত প্রেমিক এল না। সে পরিপ্লুত হতে পারল না। সে অধন্য রয়ে গেল সেই সুগন্ধি রাতে।

এই জঙ্গল-পাহাড়ের মেয়েরা প্লেটোনিক ভালোবাসায় বিশ্বাস করে না। তারা কোনোরকম ভন্ডামিতে, ভানে বিশ্বাস করে না। তারা যাকে চায়, তাকে সমস্ত মন ভরে, সমস্ত শরীর ভরে শ্রাবণের বৃষ্টির মত, শীতের কুয়াশার মত, গ্রীষ্মের রোদের মতই চায়। তারা রাতের বিছানার ভালোবাসা একজনের জন্যে রেখে, অন্যজনকে বালিগঞ্জী নেকুপুষুমুনু মনের বিচিত্র ভালোবাসায় ভুলিয়ে রাখতে চায় না। তারা গাছেরটা এবং তলারটা একই সঙ্গে খায় না। খেতে জানে না। এইটুকু সততা তাদের থাকে।

এইবার গানের কথায় আসি।

প্রেমিক রাতে আসেনি, কিন্তু পরদিন সকালে সে এসে হাজির এক আকাশ আলোর মধ্যে। রাতের অন্ধকারে যে মুকুলগুলি ফোটে, যে পাপড়িগুলি খোলে, দিনের আলোয় তারা চোখ বোঁজে—লজ্জায় তারা মুদিত হয়।

তাই প্রেমিককে দেখে পরম উষ্মাভরে প্রেমিকা বলল, নদীর ঢেউয়ের মত সময় বয়ে গেল, তুমি সময় দিয়েও সময় মত এলে না কেন?

তখন প্রেমিক বলল, আমি এসেছিলাম ঠিকই, কিন্তু তোমার বাড়ির যে কালো কুকুর—সে একটু হলে আমার মাংস ছিঁড়ে খেয়েছিল আর কি!

প্রেমিকা কুকুরের কুকীর্তির কথা জানতে পেরে খুব রেগে বলল কুকুরকে—ওরে লম্বা-লেজওয়ালা গোমড়া-মুখো কুকুর, তুই যখন আমার এমন সর্বনাশ করলি, তোকেও আমি দেখে নেবো। আসুক ভাদ্র মাস, তোদের মিলন মাস; তখন তোর পেট বেঁধে রাখব আমি।

কুকুর এ কথা শুনে খুব বিচলিত ও লজ্জিত হল।

বলল, আমি কি আর জানি যে, এ তোমার প্রেমিক। যেমন করে চুপি চুপি, লুকিয়ে লুকিয়ে ও আসছিল, আমি তো ভেবেছিলাম, সে কোনো চোর। আমি যদি জানতাম তোমার সঙ্গে তার ভাব-পিরীতি, তাহলে আমার লেজ মাড়িয়ে গেলেও আমি কিছু বলতাম না।

গান-টান শুনিয়ে ওরা আবার ওদের ঘরে চলে গেল হাসাহাসি করতে করতে।

ইতিমধ্যে রাতও হয়েছে অনেক। রান্নাও হয়ে গেছে।

আমরা শ্যামলবাবুর ঘরের মেঝেতে কম্বল পেতে খেতে বসলাম।

গরম গরম খিচুড়ি, আলুভাজা, ডিমভাজা আর সঙ্গে একটু কষামাংস। শুধোলাম, কিসের মাংস এটা?

শ্যামলবাবু পরিবেশনকারীর দিকে আড়চোখে তাকালেন, তারপর বললেন, কি রে? ঋজুবাবুকে বলেই দি, কেমন? উনি তো ঘরের লোক।

তারপর বললেন, আজ সকালে যেখানে ফেলিং হচ্ছিল, তার কাছেই একটা খুরাশি মেরেছিল এক মুহুরী তীর-ধনুক দিয়ে। চুরি করে। এ তারই মাংস। দেখছেন না কি নরম! ভালো করে খান। হারামীকে খেয়ে, হারামীকে মারার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যাক। তবে ভুল করেও রেঞ্জার সাহেব বা ডি. এফ. ও. সাহেবকে বলবেন না কিন্তু!

আমি হাসলাম। বললাম, খেয়েই যখন ফেলেছি, এখন আর কি করে বলি? বললে তো নিমকহারামী হবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর শ্যামলবাবু বললেন, এবার একটা ছোট্ট বিউটি-স্লিপ দিয়ে নিন। তারপর আমিই তুলে দেবো আপনাকে। আমিও বসব আপনার সঙ্গে ঝুপরীতে।

বললাম, যা আজ্ঞা করবেন।

তারপর জামাকাপড় পরেই কম্বলটা গায়ে দিয়ে শ্যামলবাবুর পাশে তাঁর মাচায় শুয়ে পড়লাম।

যখন শ্যামলবাবু আমাকে ঠেলে তুললেন তখন রাত প্রায় একটা। ইতিমধ্যে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঠাণ্ডাটা আরো জোর হয়েছে। মাটির ঘর থেকে, বাইরের জঙ্গল থেকে বৃষ্টিভেজা মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছে।

শ্যামলবাবু একটা মাটির হাঁড়িতে কাঠকয়লার আগুন করে নিলেন। তারপর হাঁড়িটা নিয়ে চললেন আমার সঙ্গে সঙ্গে।

আমরা টর্চ জ্বালিয়ে তৈলার মধ্যে দিয়ে তৈলার পিছনে জঙ্গলের দিকে যেতে লাগলাম। কতগুলো খরগোশ কান উঁচু করে চীনাবাদামের ক্ষেতে চীনাবাদাম খাচ্ছিল।

শ্যামলবাবু বললেন, হারামীর বাচ্চারা সব নষ্ট করে দিল। বলেই, সরাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে হাততালি দিয়ে ওদের তাড়িয়ে দিলেন।

ঝুপরীটা একেবারে জঙ্গলের গা ঘেঁষে বানানো। খড়ের চাল, এক কোমর

উ'চু, ভিতরে কাঁচা বাঁশের মাচা।

আমরা দু'জনে পাশাপাশি বসলাম। মধ্যে হাঁড়িটা রেখে।

রাইফেলের ম্যাগাজিন খুলে গুলি ভরে নিলাম। চেম্বারে একটা ও ম্যাগাজিনে পাঁচটা। থ্রি-সিক্সটি-সিক্স্ রাইফেলটা নিয়েই এসেছিলাম।

প্রথম আধঘণ্টা কোনো জানোয়ারের সাড়াশব্দ পেলাম না।

বোষ্টমনালাটা তৈলার পিছন দিয়ে ঘুরে ঢুকে গেছে সেগুনের প্ল্যান-টেশানে। নালার ওপাশ থেকে একটা কোট্‌রা ডাকতে লাগল বার বার ভীত স্বরে।

বোধহয় বাঘ কি চিতা দেখে থাকবে।

একটা শজারু এল তৈলার বেড়া গ'লে। বেশ বড় শজারু।

শ্যামলবাবু কম্যান্ড করলেন, বললেন, মারুন।

রাইফেলে আলো লাগানোই ছিল আমার। রাইফেল তুলে গুলি করলাম। শজারুটা লক্ষ্মী ছেলের মত পড়ে গেল। পড়ে গিয়েই ওঠার চেষ্টা করল কিছু-ক্ষণ। তার গায়ের কাঁটার ঝর্‌ঝর্ শব্দ শোনা গেল।

তারপর আবার সব চুপচাপ।

আমরা আজ ঝুপরীতে পাহারায় বসেছি বলে তৈলার লোকেরা আরামে ঘুমোচ্ছিল। নইলে সারারাত জেগে ওরা তাল-পট্‌কা ফাটায়। মুহুরীদের ঘর থেকে ফিতে কমিয়ে-রাখা লণ্ঠনের আলো মাটির দেওয়ালের ফাঁক-ফোঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। এই শীতার্ত জঙ্গলের রাতে কাছেপিঠে যে মানুষ আছে, শোওয়ার মত একটা ঘর আছে, তাতে আগুন আছে, এ কথা জেনেও ভালো লাগে খুব।

কিছুক্ষণ পর একদল বাইসন এল নালার দিক থেকে। তাদের ভারী শরীরে চলাফেরার শব্দ পাওয়া গেল নালার পাথরে পাথরে। তারপর তারা তৈলার বেড়ার কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু ভিতরে ঢুকল না। নাক দিয়ে ফোঁ-ফাঁ করে আওয়াজ করতে লাগল। একটা মাদী বাইসন বোঁ-য়া-ও-ও করে ডেকে উঠল একবার। তারপর সদলবলে তৈলার পিছনের জঙ্গলে ঢুকে গেল।

ফরেস্ট অফিসের কাছেই কয়েক ঘরের একটা বস্তি ছিল। হঠাৎ সে বস্তি থেকে একটা শোরগোল উঠল। নারী ও পুরুষকণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল। শ্যামলবাবু বাঁ কানে হাত চেপে, ডান কান ওদিকে ঘুরিয়ে শোরগোলের মর্মোদ্ধার করলেন।

বললেন, একটা মাগী এখুনি বিয়োল্লো।

তারপর বললেন, শালার এই পোড়া দেশে মিনিটে মিনিটে বাচ্চা পয়দা হয়। শুয়োরদেরও হার মানালাম আমরা। অন্য কাজ পারি আর না পারি, আমরা

সবাই এই একটি কাজে খুব দড়।

ও'র কথা বলার ধরনে আমার হাসি পেয়ে গেল। জঙ্গলে জঙ্গলে থেকে ভাষাটাও একেবারে চাঁছাছোলা হয়ে যায়। কোনো রাখা-ঢাকার প্রয়োজন নেই। আমরা যাকে "ম্যানারস্" বলি তা এখানে অনেকদিন আগেই তামাদি হয়ে গেছে।

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

শুয়োরদেব এখনও পাত্তা নেই কোনো। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু একটানা ঝিঁঝির ডাক, বৃষ্টিভেজা জঙ্গলে হাওয়াটা খস্‌খস্ আওয়াজ তুলে দমকে দমকে বয়ে যাচ্ছে। হিস্-হিস ফিস্-ফিস্ উঠছে অস্ফুট কথার মত। একটা একলা টি-টি পাখি টিটিরি-টী—টিটিরি-টী—টি-টি—টি-টি করে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে ডাকছে পিছনের বৃষ্টিভেজা জঙ্গলে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ঐ বস্তিটা থেকে আবার একটা একলা মেয়ে-গলার তীক্ষ্ন চীৎকার ভেসে এল।

পরক্ষণেই সেই চীৎকারটা কান্না হয়ে গলে পড়ল। তারপর গড়িয়ে গেল ভেজা বনে বনে।

কয়েকটা লোক একসঙ্গে স্বপ্নের মধ্যে কথা বলার মত অসংলগ্ন কথা বলে উঠল—তারপর সেই মেয়েটির কান্নাটা ঝিঁঝির শব্দের সঙ্গে, হাওয়ার শব্দের সঙ্গে, রাতের বনের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল। তাকে আর কোনো মানুষীর কান্না বলে আলাদা করে চেনা গেল না।

শ্যামলবাবু তখনও বাঁ কানে হাত চেপে ডান কান শিয়ালের মত খাড়া করে বসেছিলেন।

একটু পর কানের থেকে হাত সরিয়ে বললেন, শুনলেন?

বললাম, আমি বুঝতে পারিনি। অত ভালো ওড়িয়া জানি না আমি যে দূরের বিলাপের মানেও বুঝব।

তারপর বললাম, কি হল? বলাৎকার-টলাৎকার নাকি?

শ্যামলবাবু বললেন, আরে না; বল থাকলে তবে না বলাৎকার করবে। লোকগুলোকে দেখেন না? আফিং-এর গুঁড়ো খেয়ে খেয়ে কেমন বেঁকে গেছে।

আবার শুধোলাম, তাহলে চীৎকারটা কিসের?

ঐ মাগীর চীৎকার। ও কিচ্ছু না।

আহা। চীৎকারটা কিসের জন্যে তাই-ই বলুন না। ফিসফিস করে আমি বললাম শ্যামলবাবুকে।

শ্যামলবাবুর চোখ দুটো জ্বলে উঠল অন্ধকারে। বললেন, সত্যিই শুনবেন?

শোনবার মত কল্জে আছে তো আপনার?

আমি বললাম, কি হেঁয়ালি করছেন! বলুনই না।

উনি বললেন, যে মাগী বিয়োলো একটু আগে, তার বাচ্চাটার নরম তুল-তুলে লাল মাথাটা একটা বড় ছুঁচো এসে এক্ষুনি খেয়ে গেল—মানে ঘিলু-টিলু সব। বাচ্চাটা বেঁচে গেল। এই বিরাট গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হতে হলো না শালাকে। ও শালা জানতেও পেলো না যে, কত বড় বাঁচা ও বেঁচে গেল এ জন্মে।

আমি চুপ করে রইলাম। গলা শুকিয়ে এল। বুকের মধ্যে কিরকম করতে লাগল যেন আমার।

শ্যামলবাবু বললেন, মন খারাপ হলো না কি? মন খারাপের কি? আমাদের মেয়েরা সব সুজলা-সুফলা। দশমাস দশদিন পর দেখবেন ও আবার বিয়োবে। সে পুতের মাথা ছুঁচোয় নাও খেতে পারে। অত হতাশ হবার কি আছে?

ব্যাপারটার অভাবনীয়তা আর অবিশ্বাস্যতা আমাকে এমন করে আচ্ছন্ন করে ফেলল, স্তম্ভিত করে ফেলল যে, তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না।

অনেক অনেক ক্ষণ আমি স্থাণুর মত বসে রইলাম। শীত আমাকে ছেড়ে চলে গেল। ভীষণ একটা গরম, একটা অসহায় উপায়হীন ক্রোধ আমাকে ঘামিয়ে তুলল। ক্রোধটা কার উপর তা আমি বুঝতে পারলাম না।

শেষরাতে শুয়োর এল। হোঁৎকা-হোঁৎকা কচু-খেকো, ঘেঁচু-খেকো, গু-খেকো শুয়োর। একদল। ধাড়ি, মাদী; বাচ্চাকাচ্চাসমেত। খচর্-খচর্-খচর্-খচর্ ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করে তারা তৈলায় ঢুকল।

শ্যামলবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

বললেন, মারুন, মারুন, একটা হারামীও যেন না পালাতে পারে।

রাইফেল তুলে আমি পর পর গুলি করে যেতে লাগলাম। গুলি করি, বোল্ট খুলি, গরম ফাঁকা খোলটা ছিট্‌কে বেরিয়ে যায়, আবার বোল্ট চেপে নিয়েই গুলি করি। পাঁচটা গুলি চোখের নিমেষে শেষ হয়ে গেল।

মুখ নীচু করে যখন আবার গুলি ভরছি, ততক্ষণে শুয়োরের দল তৈলার বেড়া পেরিয়ে চলে গেছে।

মুখ তুলে দেখি চারটে ধাড়ি শুয়োর পড়ে রয়েছে। বাদবাকী একটা গুলি হয় মিস্ করেছি, নয় শুয়োর আহত হয়ে পালিয়ে গেছে। রাইফেলের মার। গুলি যদি লেগে থাকে, মোটামুটি ভালো জায়গায়, তবে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই সকালে এদিকে ওদিকে।

শ্যামলবাবু উত্তেজনায় ঝুপরী থেকে লাফিয়ে নামলেন। শুয়োরগুলোর

দিকে দৌড়ে গেলেন।

আমি বললাম, কাছে যাবেন না, বেঁচে থাকলে আপনাকে একেবারে চিরে দেবে।

শ্যামলবাবু কথা শুনলেন না। শুয়োরদের কাছে গিয়ে তাঁর রোগা-রোগা লুঙিং-পরা পায়ে লাথি মারতে লাগলেন।

তাড়াতাড়ি রাইফেল রি-লোড করে আমি যখন ঝুপরী থেকে নেমেছি ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে।

একটা বড় দাঁতাল শুয়োর—বুকে গুলি লাগা সত্ত্বেও শ্যামলবাবু তার কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় উঠে ওঁর ঊরুতে মেরে দিয়েছে।

শ্যামলবাবু ছিটকে পড়লেন দূরে হাত-পা ছড়িয়ে। লুঙি উড়িয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে শুয়োরটাকে গুলি করলাম আমি। ওটা পড়ে যেতে, রাইফেল রেডি করে ধরে অন্যান্যগুলোরও কাছে গেলাম। একটা তখনো বেঁচে ছিল—ঝুঁকি না নিয়ে আর একটা গুলি করে দিলাম ওর গলায়।

গুলির শব্দে ও চীৎকার-চেঁচামেচিতে তৈলা থেকে সবাই দৌড়ে এল।

শ্যামলবাবুকে কাঁধে করে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল।

রক্তে ভেসে যাচ্ছিলেন উনি। বাম ঊরু থেকে শুরু করে কুচকি অবধি একটা গভীর ক্ষত লম্বালম্বি চলে গেছে।

তক্ষুনি একজন মুহুরী সাইকেলে লণ্ঠন ঝুলিয়ে চলে গেল আমাদের ডেরায়—পাইকারাকে সঙ্গে করে জীপ নিয়ে আসতে। অঙ্গুলের হাসপাতালে ওঁকে নিয়ে যেতে হবে।

শ্যামলবাবু মাচার উপরে শুয়ে ছিলেন। মুখে সেই দ্ব্যর্থক হাসি। হাসি মোছেনি তখনো। উনি চেঁচিয়ে বললেন. আরে কার কাছে পানমৌরী আছে? পানমৌরীর বোতল আন শালারা।

একজন মুহুরী লেবেল-মারা পানমৌরীর বোতল নিয়ে এল।

আমি শ্যামলবাবুর দাড়ি-কামানোর ঝোলা থেকে ডেটলের শিশি বের করে ক্ষততে ডেটল দিচ্ছিলাম। জ্বালায় শ্যামলবাবু নীল হয়ে গিয়েছিলেন।

একটু পর সামলে নিয়ে, শুয়ে শুয়েই ঢক্ঢক্ করে পানমৌরী খেতে লাগলেন।

তারপর নিজেই বললেন, তোরা সব ঘর থেকে যা—হাওয়া ছাড় আমায়—আমার গরম লাগছে।

ওরা সকলে ঘর থেকে চলে গেলে, হঠাৎ শ্যামলবাবু বললেন, ঋজুবাবু, শুয়োরে কিরকম আওয়াজ করে শুনেছেন?

আমি অবাক হলাম। বললাম, কি রকম? ঘোঁৎ-ঘোঁৎ?

শ্যামলবাবু হাসলেন। বললেন, আপনি নিশ্চয়ই গান জানেন না। আপনার কান নেই।

আমি আরো অবাক হয়ে বললাম, তাহলে কিরকম আওয়াজ করে?

শ্যামলবাবু বললেন, ভালো করে কান-খাড়া করে শুনবেন। দেখবেন ওরা বলছে, ভোট দাও। ভোট দাও। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ নয়। ভোট দাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাইকারা জীপ নিয়ে এল।

শ্যামলবাবু বললেন, দেখুন তো! আপনাকে কি ঝামেলায় ফেললাম।

বললাম, তা তো ফেললেনই। কি দরকার ছিল গুলি-খাওয়া শুয়োরটাকে লাথি মারতে যাবার?

শ্যামলবাবু চুপ করে থাকলেন। জবাব দিলেন না।

পাইকারা আর ওঁর একজন মুহুরী পিছনে বসলো।

শ্যামলবাবু বললেন, আধবোতল পানমৌরী খেয়ে আমি ফিট্। আপনি জীপ চালান, আমি আপনার পাশে বসে গান গাইতে গাইতে যাব।

বললাম, থাক, আর গান গাইতে হবে না। মানে মানে চলুন তো দেখি হাসপাতাল্।

শ্যামলবাবুর চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই কতখানি জীবনীশক্তি রাখেন ভদ্রলোক। ঐ অবস্থায় অনেক তাগড়াই তাগড়াই লোককে নেহাত শক্-এই মরে যেতে দেখেছি। কিন্তু শ্যামলবাবুকে সামনের সীটে উঠিয়ে দেওয়ার পর উনি একটু কাত হয়ে আমার দিকে ঝুঁকে বসলেন, ডান হাতে পানমৌরীর বোতল নিয়ে।

জীপটা স্টার্ট নিতেই শ্যামলবাবুর বেসুরো গলার গান শুরু হল :

> "শ্যামা মা যে আমার কালো,...
> কালোরূপে দিগম্বরী,
> হৃদিপদ্ম করে যে আলো রে,
> শ্যামা মা যে আমার কালো..."

পম্পাশরে এসে পেঁাছতে পেঁাছতেই পূবের আকাশে আলো ফুটে উঠল। অঙুলে পেঁাছতে পেঁাছতে বেশ রোদ উঠে গিয়েছিল।

ডাক্তার ভালো করে দেখেশুনে জায়গাটাতে ডিস-ইনফেকট্যাণ্ট লাগিয়ে সেলাই করে দিলেন। ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন জায়গাটা ভালো করে। তারপর বললেন, ভবিষ্যতে লাথালাথি করার ইচ্ছে হলে আমাকে বলবেন, আমার বাড়ির গাছ থেকে গোটাকয় বড় বড় কাঁচা বাতাবীলেবু পাঠিয়ে দেবো—যত খুশী

িকক প্র্যাকটিস্ করতে পারেন। এ-পর্যন্ত অনেক শুয়োর-চেরা কেস্ দেখেছি মশাই, কিন্তু শুয়োরকে লাথি মারতে গিয়ে অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে এমনটি দেখিনি।

ডাক্তারবাবু ইঞ্জেকশান দিলেন, ওষুধও খাওয়ালেন। এবং সঙ্গেও অনেক ইঞ্জেকশান ও ওষুধ দিয়ে দিলেন।

শ্যামলবাবু আমায় বললেন, টাকাটা ওখানে ফিরে আমি ফেরত দিয়ে দেবো আপনাকে। যা খরচ হল, তা একমণ কুল্থীর দাম। কোনো মানে হয়? একটা ঠ্যাং বাঁচাতে একমণ কুল্থী নষ্ট? আবারও নাকি সাতদিন পরে দেখাতে আসতে হবে!

ফেরার সময় আমি বললাম, ডাক্তারবাবু কি বললেন, মনে থাকবে তো?

শ্যামলবাবু সখেদে বললেন, লাথি কি ওদের মারতে চাই? না চেয়েছিলাম কখনও? যে-সব মুখে মারতে চাই, সে-সব মুখে লাথি মারার সুযোগ কোথায় আমাদের মত ছোটখাট নগণ্য জঙ্গলী লোকদের?

একটু চুপ করে থেকে বললেন, আসলে ব্যাপারটা কি জানেন ঋজুবাবু, লাথি আমরা প্রত্যেকেই মারতে চাই কখনও কখনও কাউকে কাউকে। শুয়োর-গুলো উপলক্ষ মাত্র। এই লাথি মারার ইচ্ছাটা আমাকে মাঝে মাঝে পাগল করে তোলে, একেবারে উন্মাদ করে তোলে। কিন্তু এই একার দুব্লা পায়ে আর জোর কতটুকু?

তারপরই বললেন, আপনার লাথি মারতে ইচ্ছা করে না?

আমি উত্তর না দিয়ে স্টীয়ারিং ধরে সামনে রাস্তায় চেয়ে রইলাম।

॥ ৪ ॥

দেখতে দেখতে আবার পূর্ণিমা ঘুরে এল।

এসে অবধি সুযোগ খুঁজছিলাম চাঁদনী রাতে একা একা জঙ্গলে ঘোরবার। ইস্‌স্‌, কতদিন, কতদিন যে এমন ঘুরিনি! প্রকৃতির বুকে এলে আমি যা শান্তি পাই এমন আর কোথাওই পাই না। একদিন বলেছিলাম, তোমাকে আমি প্রকৃতির চেয়েও ভালোবাসি। সে কথা মিথ্যে কথা। প্রকৃতির মত ভালো-বাসতে পারিনি আমি এ পৃথিবীর কোন নারীকেই। কোনো নারীকেই। প্রকৃতি কখনও নিক্তি-হাতে মেছুনীর মত ভালোবাসতে জানেনি। কি পেয়েছে আর কি দিয়েছে তার হিসাব করেনি। যে-ই তাকে উজাড় করে ভালোবেসেছে, তাকেই সে ভালবাসা সে শতগুণে ফিরিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর যে-কোনো নারীর চেয়েই প্রকৃতি বিশ্বস্তা। প্রকৃতিই একমাত্র সুন্দরী, সুগন্ধী, সুবেশা নারী, যে কখনও বিশ্বাস ভাঙেনি কারো।

খাওয়া-দাওয়ার পর বেরিয়েছিলাম, সারা রাত ঘুরে বেড়াব বলে। কোনো উদ্দেশ্য অথবা কোনো গন্তব্য ছিল না। একা একা বসে এক বোতল স্কচ-হুইস্কি খাওয়ার নেশার মত তারিয়ে তারিয়ে সময় নিয়ে আজ প্রকৃতির নেশায় বুঁদ হবো ভেবেছিলাম।

এ নেশার কাছে অন্য সব নেশা হেরে যায়। এল-এস-ডি, মারিজুয়ানা, হুইস্কি, স্লিপিং পিল—কোনো কিছুই এ নেশার সমকক্ষ নয়। এ নেশায় জ্ঞান টন্‌টন্‌ করে, কিন্তু শরীর ক্লিষ্ট হয় না। শুধু মন এক অদ্ভুত স্বপ্নিল আবেশে আবিষ্ট হয়। যে এ নেশা করেছে, এ নেশায় মজেছে যে, শুধু সেই-ই জানে এ নেশার তাৎপর্য।

জঙ্গলে পাহাড়ে এলেই আমার বিভূতিবাবুর কথা বড় মনে পড়ে। তাঁর জীবিতাবস্থায় তাঁকে দেখার বা তাঁর সঙ্গে আলাপিত হওয়ার কোনো সুযোগ হয়নি আমার! তিনি যখন মারা যান তখন আমার বয়স বেশী নয়। কিন্তু আমার মনে তিনি চিরদিনই আছেন। যখনি ইচ্ছা, তখনি ওঁকে আমি রেজারেকটেড্‌ করে নিই। তাঁর পাশে পাশে জঙ্গলের পথে চলি। মহা-লিখাপুরের পাহাড়, নাড়া বইহার, লবটুলিয়া বইহার, সরস্বতী কুণ্ড এরা সব

আমার মনে প্রোথিত হয়ে রয়েছে। যেমন রয়েছে আরো লক্ষ লক্ষ পাঠক-পাঠিকার মনে।

ভারী ইচ্ছে হয় এ পোড়া চোখ যা দেখে, এ কান যা শোনে, এ মন মনে মনে যে ভাবনার জাল বোনে তা পাঠক-পাঠিকার মনেও পেঁছে দিই। কিন্তু আমার সে সাধ্য কোথায়? বিভূতিবাবু তো গন্ডায় গন্ডায় জন্মাবেন না বাঙলায়। উনি উনিই। ও'র চোখ পাইনি, পাইনি ও'র কলম, আমার মত সাধারণ অক্ষম একজন উত্তরসূরী শুধু যন্ত্রণাই পাই, যখন বুঝি কিছুই তো হলো না। কিছুই পারলাম না।

উনি শুধু বাজাতেন না, উনি নিজেও বাজতেন তার সঙ্গে। আর বাজনা এবং বাজিয়ের সমস্তটুকু অনুভূতি পেঁছে দিতে পারতেন পাঠক-পাঠিকার মনে মনে। আমি কখনও ও'র মত বর্ণনা দিতে পারব না জঙ্গলের, যেমন পারব না আমীর খাঁ কি ভীমসেন যোশী তাঁদের শ্রোতাদের যে চরম সুখের স্বর্গে পেঁছে দেন, সেই স্বর্গে পাঠক-পাঠিকাকে পেঁছে দিতে। আমার সাধ্য যে বড়ই সীমিত।

বিভূতিবাবুর লেখার কথা মনে হলেই বড় হীনম্মন্য বোধ করি। তাছাড়া, উনি যে-চোখে প্রকৃতিকে দেখেছিলেন, আমার যে সে অনাবিল চোখ নেই। ওঁর নায়ক এমন চাঁদনী রাতে ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলের আলোছায়ার বুটিকাটা পথে যেতে যেতে পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সম্বরকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর চোখে প্রকৃতি এক সুন্দরী মোহময়ী রহস্যময়ী নারী। দুঃখের বিষয় এই যে, আমি যে কবির চোখে দেখতে পারিনি প্রকৃতিকে। রাতের সম্বরের রূপ দেখেই আমি ক্ষান্ত হইনি, তাকে গুলি করে মেরেছি, তার চামড়া ছাড়িয়েছি নিজে হাতে। তার পেট চিরে ফেলার পর যে একটা বদ গন্ধ বেরোয় সে গন্ধে বহু বহুবার আমার নাক ভরে গেছে। তাই আমার নাকে বুনোফুলের গন্ধ আর লাগবে না ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম, আমার নাকও কসাইয়ের নাক হয়ে গেছে। তবু কি আশ্চর্য! এখনও ফুলের গন্ধ আমাকে তেমনি করেই আচ্ছন্ন করে!

বিভূতিভূষণ যে রমণীকে সুন্দর পোষাকে, সুগন্ধি মহিমায় চাঁদনী রাতে রহস্যময়তার প্রতীক হিসেবে দেখেছেন, তাকে আমি রমণ করেছি। তার সমস্ত রহস্য উন্মোচন করেছি। তাব বুকের লাল তিলে চুমু খেয়েছি, তার স্তনাগ্র দাঁতে কেটেছি। তার বাহুমূলে নাক রেখেছি। তার চিকন কালো পেলব জঘনের নরম রোমে মুখ ডুবিয়েছি, তার কানের লতিতে সুড়সুড়ি দিয়েছি, তার গ্রীবায় আলতো করে ঠোঁট ছুঁইয়েছি। অথচ প্রকৃতি এমনই এক আশ্চর্য

নারী যে, সে কখনও ফুরোয়নি, কখনও পুরোনো হয়নি; তাই তো বারে বারে তার চেনা বুকে ফিরে আসা, তার শরীরে নিত্য নতুন যাওয়া। এক নির্মোহ, নির্বেদ, নিষিদ্ধ আনন্দর সঙ্গে তাকে বার বার নতুন করে ফিরে ফিরে পাওয়া।

দুশ্চরিত্র—আমার এই চোখ আবিল হয়ে গেছে। নারীর বহিরঙ্গ রহস্যময়তায় মন ভরেনি আমার। নগ্নতায় নামিয়ে এনে বারবার আঁতিপাঁতি করে চিনেছি আমি, খুঁজেছি তার শরীরের সব ভাঁজ, বাকি রাখিনি কিছুই; সব সময় ভয়ে মরেছি যে, সে বুঝি আমাকে তার সম্পূর্ণতায় ধরা দিল না। কিছু বুঝি বাকি থেকে গেল।

বোষ্টমনালার পাশ দিয়ে, শ্যামলবাবুর তৈলার সামনে যে পাকদণ্ডী পথটা ছোটকুঁইয়ে চলে গেছে, সে পথে রওয়ানা হলাম পায়ে হেঁটে। ইচ্ছে ছিল ছোটকুঁই থেকে টুম্বেকা অবধি যাব, আবার ফিরে আসব। সারা রাতের টহল।

পাকদণ্ডী পথটা গেছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। মাঝে মাঝে পাহাড়ি ঝর্ণা তির্ তির্ করে বয়ে গেছে পথের উপর দিয়ে। এ পথে দিনান্তে কেউ কখনো যায় না। তখন রাতের প্রাণীদের যাতায়াতের সড়ক এটা।

চতুর্দিকেই ঘন জঙ্গল, মাথার উপর জঙ্গলের চন্দ্রাতপ, চাঁদের আলো চুঁইয়ে আসছে সামান্য পাতার ফাঁক-ফোঁক দিয়ে। এ পথে অন্য কোনো ভয় নেই। একমাত্র ভয়, বাঘ চিতা কি ভাল্লুকের মুখোমুখি পড়ে যাওয়া। পথটা এত সরু যে, কাছাকাছি মুখোমুখি পড়ে গেলে অতর্কিতে ঘাবড়ে গিয়ে তারা আক্রমণ করে বসতে পারে তাদের সহজাত বাঁচার বোধে।

পথের দু'পাশে লজ্জাবতীর জঙ্গল। কণ্টিকারীর ঝোপ-ঝাড়। কতগুলো জায়গায় বনতুলসীতে ছেয়ে গেছে। আকন্দর ডালপালা ছড়িয়ে গেছে চারদিকে। মাঝে মাঝে কেরকেরী লতার ঝাড়। এই কেরকেরী আকন্দ এসব দিয়ে এখানে গাদা বন্দুকের বারুদ তৈরী করে স্থানীয় লোকেরা।

এগুলো ঝোপ-ঝাড়। লতাপতা—নীচে নীচে। তাছাড়া মাথা উঁচু করে আছে চারপাশে কত রকম যে গাছ! কুমারী জঙ্গল। এসব জায়গায় এখনো কূপ্ দেননি ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট। শাল, সেগুন, বাত্‌রা, রশি বন্ধন, তেঁতরা গাম্‌হার, মিট্‌কুনিয়া, শলাই, কুচিলা, শিশু আরো কত শত হরজাই গাছে জড়াজড়ি করে হাত ধরাধরি করে আছে বন।

এক জায়গায় ঝর্ণার নীচে অনেকখানি জায়গায় ঘাস গজিয়েছে কচি কচি। একটা কোট্‌রা পট্‌পট্ করে ঘাস খাচ্ছিল। মোড়ের মাথায় আমাকে দেখতে পেয়েই ব্বাক্ ব্বাক্ করে দৌড়ে পালাল ঝোপ-ঝাড় ঠেলে।

উল্টোদিকের জঙ্গল থেকে একটা চিতাবাঘের গলার করাত-চেরার মত

আওয়াজ এল কানে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘুমন্ত জঙ্গল জেগে উঠল গাছে গাছে হনুমানদের হুপ্-হুপ-হুপ্ আওয়াজে। পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সে ডাক আবার ফিরে এল বনে। তারপর পাতায় পাতায় কাঁপতে থাকল।

উঁচু শিমুলের ডালে বসা ময়ূর হঠাৎ কি জানি কেন ডেকে উঠল তীক্ষ্ন স্বরে, কেঁয়া কেঁয়া কেঁয়া করে। সমস্ত জঙ্গল রিন্‌রিন্ করে উঠল। মাইল দুয়েক আসার পর পথের অনেকখানি সামনে, পথের বাঁদিকে একদল সম্বর ঘ্বাক্ ঘ্বাক্ ঘ্বাক্ করে ধাতব ডাক ডেকে জোরে জঙ্গলের গভীরে দৌড়ে গেল। ডানদিকের জঙ্গলে হনুমানরা নতুন করে সোচ্চার হয়ে উঠল। হঠাৎ আমার মন বলল, এই রাস্তা ধরেই বড় বাঘ আসছে হয়ত।

জঙ্গলে জঙ্গলে রাত-বিরেতে হঠাৎ হঠাৎ এরকম মনে হয় আমার মত আনাড়ি লোকদেরও। একেই বোধহয় বড় বড় শিকারীরা বলেন "সিকস্‌থ্ সেন্‌স্"।

পায়ে রাবার সোলের হাল্‌কা জুতো ছিল। তাড়াতাড়ি রাস্তা ছেড়ে ডান-দিকের জঙ্গলের মধ্যের এক ফালি ঘাস-জমিতে নেমে গেলাম। নেমে গিয়ে পথের থেকে কুড়ি-পঁচিশ গজ দূরে একটা মোটা বন্ধন গাছের আড়ালে শরীরটা লুকিয়ে দাঁড়ালাম।

মন বলছিল, বাঘটা এদি'কই আসছে।

মিনিট তিনেকের মধ্যেই বাঘটাকে দেখা গেল। কোমর দুলিয়ে একটা সুন্দর নিঃশব্দ ছন্দে বাঘটা হেঁটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে মাথাটা একবার এদিকে আর একবার ওদিকে ঘোরাচ্ছে। চলমান বাঘটার গায়ে চাঁদের আলো পড়েছে। কিন্তু অল্প অল্প। পাতার চন্দ্রাতপের জন্যে বাঘটার পিঠের কালো ডোরার মত চাঁদের আলোর ডোরা পড়েছে তার গায়ে। চলার সময় তার সামনের কাঁধ দুটো ও পিছনের পা দুটির সংযোগস্থলে দারুণ এক ওঠানামা হচ্ছে।

বাঘের চলার মধ্যে একটা দারুণ রাজা-রাজড়া ভাব আছে—একেই বলে, বাঘের চাল। বাঘের চালই আলাদা। চেহারা না দেখেও অন্ধকারে যে কোন জানোয়ারের চাল দেখেই বোঝা যায় ওটা কী জানোয়ার, যেমন দূরের আকাশের পাখির ঝাঁকের ওড়ার ভঙ্গী ও ঝাঁকের গড়ন দেখে বলা যায় ওটা কি পাখির ঝাঁক।

বাঘটা দুল্‌কি চালে চলে গেল। আমাকে ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা যাবার পর একটা চাপা গর্জন করল। তারপর আর কোনো আওয়াজ হল না।

বাঘটা চলে যাওয়ার পর আবার রওয়ানা হলাম।

আরও কিছুদূর যাবার পর দূর থেকে সামনে চন্দ্রালোকিত এক বিরাট প্রান্তর দেখা গেল। কোনো টানেলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে দূর থেকে সূর্যালোকিত বাইরেটা যেমন দেখায়, তেমন। এই পাকদণ্ডী শেষ হবে জেনে ভাল লাগল। এ পথটায় ঢুকে পড়া থেকেই বেশ অস্বস্তি লাগছিল। জানোয়ারের ভয় আমার নেই। আমার কেন, কারোরই থাকা উচিত নয়। ভয় যা তা শুধু দু'পেয়েদের থেকে। তবে জঙ্গলে কতগুলো অলিখিত নিয়ম আছে। সেগুলো মেনে চলা সবসময়েই নিরাপদ।

পথটার প্রায় শেষাশেষি এসেছি, এমন সময় দেখলাম, একদল চিতল হরিণ ঐ চন্দ্রালোকিত প্রান্তরে চরে বেড়াচ্ছে। পাকদণ্ডীর ছায়াচ্ছন্ন পথ থেকে বেরোলেই ওরা আমাকে দেখতে পেয়ে পালিয়ে যাবে। অথচ ওদের দেখতেও ইচ্ছে করছিল খুব। তাই ছায়ার মধ্যেই পথের শেষে একটা বড় পাথরের উপর বসলাম একটু জিরিয়ে নেবার জন্য। পাইপটা বের করে তামাক ভরতে লাগলাম। তামাক ভরলাম। কিন্তু এখন জ্বালানো যাবে না। আলো দেখলেই ওরা পালিয়ে যাবে। পাথরে বসে ওদিকে চেয়ে রইলাম।

চিতল হরিণের দলটি ঘুরে ঘুরে চরছে—নিজেদের মধ্যে গুঁতোগুঁতি করছে। শিঙে খটাখট্ আওয়াজ হচ্ছে। মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে, টাঁউ টাঁউ টাঁউ করে। হরিণদের ডাকে কোনো সুরের রেশ থেকে যায় না। পর্দা থেকে অন্য পর্দায় গড়ায় না সুর। এক বা একাধিক পর্দায় চড়া সুরে হঠাৎ বেজে উঠেই সে ডাক থেমে যায়।

ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে বসে বাইরের চন্দ্রালোকিত প্রান্তরের দিকে চেয়ে তোমার কথা বড় মনে হচ্ছিল। এরকম হঠাৎ হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ে যায় আমার। অবচেতনে তুমি সবসময়ই থাকো, মাঝে মাঝেই চেতনে এসে তোমার নরম হাতের মৃদু করাঘাত করো। চিরদিন আমার জীবন এমনি অন্ধকারাচ্ছন্নই ছিল। এমনি এক অন্ধকার টানেলের মধ্যে দিয়ে, প্রতিপদে ভয় ও দ্বিধা নিয়ে হেঁটেছি আমি জীবনের অনেকগুলো বছর। কিন্তু আমার চোখ ছিল বাইরের এক উজ্জ্বল আলোকিত প্রান্তরে। আশা ছিল, একদিন সেখানে পেঁছিব। তোমার মত করে আর কেউই জানে না যে, তুমিই আমার সেই একমাত্র আলোকিত প্রান্তর।

কিন্তু যতবারই তোমার কাছাকাছি পেঁছেছি—অন্ধকারটাই কোনো দৈব-দুর্বিপাকে আমাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে—তোমার এবং আমার মধ্যের দূরত্ব আগের মতই থেকে গেছে। থেকে গিয়েছিল। তবুও আমি হেঁটেছিলাম, তোমার আলোর দিকে মুখ করে। চিরদিন; চিরদিন। তুমি কিন্তু কখনও

এগিয়ে আসোনি, হাত বাড়াওনি কোনোদিন; হাত রাখোনি হাতে।...

অনেকক্ষণ ওখানে বসে থাকার পর আমি প্রান্তরে নামলাম। মাথার উপরে পূর্ণিমার চাঁদ—ঘাস, ঘাসফুল, লতাপাতা, সব শিশিরে ভিজে রয়েছে। চাঁদের আলোয় সুপ্ সুপ্ করছে চারদিক।

একটা হরিণ মুখ তুলেই আমাকে দেখতে পেল। দেখতে পেয়েই ডাকল, টাঁউ। আর অমনি পুরো দলটি চাঁদের মাঠ পেরিয়ে চাঁদের দিকে উড়ে গেল।

হরিণের দল যখন ফাঁকা জায়গা দিয়ে দৌড়ে যায় তখন মনে হয় না যে ওরা দৌড়চ্ছে। ওরা এমনভাবে হাওয়া কেটে যায় যে মনে হয় ওরা উড়েই যাচ্ছে।

প্রান্তরটা পেরোলাম। শিশিরে আমার ট্রাউজারের নিচের দিকটা এবং জুতো ভিজে গেল। তারপর ধূলিধূসরিত পথে এসে উঠলাম।

এই টুল্বকার পথটি ভারী ভাল লাগে। বাঁ পাশে এক জায়গায় ক্লিয়ার-ফেলিং হয়েছিল, তারপর সেগুনের চারা, শালের চারা, লজ্জাবতী, কেরকেরী, বনতুলসী, গিলিরী, মুতুরী সব লতা গজিয়ে উঠেছে এক হাঁটু সমান। চাঁদের আলোয় ভোর হয়ে গেছে ভেবে একটা হলুদ-বসন্ত পাখি নীচু দিয়ে উড়ে চলেছে পাহাড়ের দিকে। মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে কুঁচিলা-খাঁই পাখিগুলো কুঁচিলা গাছে বসে হঠাৎ হ্যাঁক্ হ্যাঁক্ হ্যাঁক্ হক্ক হক্ক করে ডেকে উঠল। তারপর আবার হঠাৎই থেমে গেল।

এই জঙ্গলে একটা বুড়ো বাইসন আছে। তার গায়ের রঙ পেকে বাদামী হয়ে গেছে। রণক্লান্ত ট্যাঙ্কের মত সে একা একা ঘুরে বেড়ায়, ধুলোয় গড়ায়, জীবন সম্বন্ধে ওর আর কোন ঔৎসুক্য নেই।

একটা একলা সম্বরও আছে। এ জায়গায়। এককালীন যূথপতি, অধুনা বিতাড়িত। একটা ছোকরা সম্বর নিছক তার গায়ের জোরে ওকে মেরে ক্ষত-বিক্ষত করে তাড়িয়ে দিয়েছিল একদিন দল থেকে। ওর এতদিনের সঙ্গিনীরা কোন প্রতিবাদ করেনি। মূক উদাস চোখে তারা দাঁড়িয়ে থেকেছে—। তারপর পুরনো সর্দার একা একা আহত অবস্থায় চলে যেতেই নতুন সর্দারের সবল ঊরু চেটেছে ওরা প্রেমভরে। মাদী সম্বররাও অন্য যে কোন মানবীরই মত। ওদের বিবেক নেই। ওরা যে কোন মূল্যেই ওদের সুখ ছিনিয়ে নিতে জানে পৃথিবীর কাছ থেকে।

ঐ শিঙাল সম্বরটার সঙ্গেও আমার প্রায়ই দেখা হয়। তার বিরাট ডাল-পালা-সম্বলিত শিঙের ভার মাথায় নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। তার গলার কাছে ঝুলে-পড়া কেশরগুলোকে দাড়ির মত মনে হয়। পথের বাঁকে পাহাড়ের গায়ে সে একা একা দাঁড়িয়ে থাকে—তার মাথার পিছনের পটভূমি চাঁদের আকাশ।

বুনো হাওয়াতে ও ওর পুরনো সঙ্গিনীর গায়ের চেনা গন্ধ পায়। বাঘের গন্ধও পায়। এক গন্ধ ওর জীবনের ও যৌবনের। অন্য গন্ধ ওর মৃত্যুর। কোনো প্রাগৈতিহাসিক অস্ফুট বোবা বোধের মত সে জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গমে দাঁড়িয়ে থাকে এক মুহূর্ত। তারপর অবহেলায় তাচ্ছিল্যে ঘ্বাক্ ঘ্বাক্ করে দাড়ি দুলিয়ে যেন হেসে ওঠে।

একটা বড় বাঘ অনেকক্ষণ আগে ওর পিছু নিয়েছিল।

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বাঘটা পায়ে পায়ে ওর দিকে এগিয়ে যায় হাওয়ার উল্টোদিক থেকে. যেদিক জীবন, যেদিক যৌবন তার পুরোপুরি বিপরীত দিক থেকে। একটু পর কোণাকুণিভাবে বাঘটা ওর ঘাড়ে লাফিয়ে উঠে এক ঝটকায় ওকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ওর টুঁটি টিপে ধরবে। মরতে মরতে বুড়ো, বিতাড়িত, সমস্ত কর্তব্য-কর্ম-সম্পন্ন-করা সম্বরটা ঘ্বাক্ ঘ্বাক্ করে জড়িয়ে জড়িয়ে ডেকে উঠবে। বাঘটা ভাববে ও বুঝি যন্ত্রণায় কাঁদছে। সম্বরটা জানবে, ও আনন্দে হাসছে।

তারপর তার স্বর থেমে যাবে।

গলার উপরের ফুটো দুটো দিয়ে টাট্কা গরম ঘন রক্ত বেরিয়ে আসবে। বাঘটা শীতের রাতে ওর খসখসে জিভ দিয়ে সম্বরের গলার বড় বড় লোম শুদ্ধু সেই রক্ত চেটে চেটে খাবে। তারপর বাঘটা এবং সম্বরটা দুজনে দুজনকে ধন্যবাদ দেবে শেষবারের মত। দুজনেই দুজনকে বলবে, তুমি যেমন মেকানি-কালি প্রায়ই বলতে আমাকে, বলবে—"ইট্স্ ভেরী কাইন্ড অফ উ্য।"

সামনেই পথের বাঁদিকে কতগুলো বড় বড় শালের জঙ্গলের মধ্যে একটা 'নুনি' আছে। ইংরিজীতে বলে সল্ট-লিক্—বাংলায় নোনামাটি।

এখানে রোজ রাতে অনেক জানোয়ার আসে নোনামাটি চাটতে।

আশেপাশের শাল গাছগুলো এত বড় যে, তাদের কোনোটাতেই সহজে চড়া যায় না। প্রথম ডালগুলোই এত উঁচু থেকে বেরিয়েছে। শাল-জঙ্গলের মধ্যে একটা একলা পলাশ গাছ ছিল ঝাঁক্ড়া ডালের। তার উপর উঠে বসলাম আমি। সামনে 'নুনি'টা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলোয়।

কিছুক্ষণ বসার পর বাইসন এল একদল। তারা নুন চাটল চক্চক্ করে। একটা বাচ্চা বাইসন পুরো দলটার পায়ে পায়ে দৌড়ে বেড়াল নিজের আনন্দে বাছুরের মত।

এখানে একবার একটা হাতীর বাচ্চা হওয়া দেখেছিলাম। বিরাট একটা পলিথীনের থলের মত গোলাকার থলে ভূমিষ্ঠ হলো। হাতী-মা তার কান দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে সেই গোলাকৃতি বলে বাতাস দিতে থাকল। তারপর

একসময় সেই গোলাকৃতি জলীয় বলটা ভুস-স-স্ আওয়াজ করে ফেটে গেল। জল-জল, পিছল পিছল অনেক তরল পদার্থ বেরিয়ে পড়ল। তার মধ্যে থেকে হস্তীর গাবলু-গুবলু বাচ্চাটা বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকল। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে হাতী-মা'র প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তনে শুঁড় লাগিয়ে দুধ খেল। আরও কিছুক্ষণ পর তার মায়ের সঙ্গে, ওদের দলের সঙ্গে বাচ্চাটা টল্‌তে টল্‌তে, পড়তে পড়তে. উঠতে উঠতে হাঁটতে শুরু করল।

একটু পরে একদল নীলগাই এল। এদের যে কেন গাই বলে জানি না। দেখতে এরা প্রায় ঘোড়ার মত। বরং বিহারী নামটা এদের ভাল—ঘোড়াপটাস্ বা ঘোড়ফরাস : ওড়িয়াতে বলে ঘড়িঙ্। গায়ের রঙ নীল আর ছাইয়ে মেশা। প্রচণ্ড জোরে দৌড়তে পারে। ঘোড়ার মত ঘুরে ঘুরে বৃত্তর মধ্যে দৌড়য়—যখন খেলা করে, শৃঙ্গার করে। চাঁদনী রাতে ওদের গায়ের সাদাটে রঙের জন্যে দেখতে ভারী ভালো লাগে।

আরও পরে এক জোড়া বড় ভাল্লুক এল, কট্‌রঙ্গের দিক থেকে। তারা নুন চাটল না। কিন্তু নুনির উপর দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে কোথায় না জানি চলে গেল। এখন মহুয়া বা আমের সময় নয়, বোধহয় মৌচাকের খবর পেয়েছে কোথাও অথবা কন্দমূলের বা উইয়ের ঢিপির। ভাল্লুকের মত সদা-ব্যস্ত হাস্যোদ্দীপক এবং ভয়াবহ জানোয়ার বনেজঙ্গলে বড় একটা দেখা যায় না।

রাস্তাটা চলে গেছে টুল্বেকা। টুল্বেকার ছোট ফরেস্ট বাংলোয়। বাংলোর বৃদ্ধ, খর্বকায় বলিরেখাভরা-মুখের চৌকিদারের নামটা অবিশ্বাস্য। তার নাম খুকী। টুল্বেকা পেরিয়ে ভুরাণ্ডি হয়ে জানিসাহী হয়ে পথটা জঙ্গলে পাহাড়ে ভাসতে ভাসতে চলে গেছে নরসিংহপুর।

ঘড়ির ডায়ালে দেখলাম রাত দুটো। এবার ফিরতে হবে। ফেরার পথে আর পাকদণ্ডীতে ঢুকলাম না। ছায়াগুলো এতক্ষণে নিশ্চয়ই দীর্ঘতর হয়ে এসেছে সেখানে। শেষ রাতে ওপথে যাওয়া বড় বেশী বিপজ্জনক হতে পারে।

একটা একা উড্-ডাক একটা কাপাস গাছে বসে অদ্ভুত গলায় ডাকছিল। চাঁদের আলোয় তার চেহারাটা দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু পালকের রঙ চেনা যাচ্ছিল না। অদ্ভুত এই হাঁসগুলো। হাঁসের মতই জোড়া-পা এদের, দেখতেও প্রায় হাঁসেরই মত, কিন্তু রাত কাটায় জঙ্গলের মধ্যে গাছের ডালে।

উড্-ডাকটাকে অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করলাম। তাতে তার কোন ভয়ের লক্ষণ দেখা গেল না। সে যেমন আশ্চর্য ডাক ডাকছিল তেমনি ডেকেই চলল।

একসময় ছোটকুই-এর দিকের পথে পা বাড়ালাম। ছোটকুই হয়ে পুরুনা-কোটে ফিরবার জন্যে

॥ ৫ ॥

আজ অষ্টমী পুজো।

অষ্টমী পুজোর দিন বাড়ির বড় ছেলে নতুন ধুতি পায়। বাড়িতে ভাল খাওয়া-দাওয়া হয়। কাবাড়িরা অনেকেই আগের দিন ছুটি নিয়ে যে যার গ্রামে রওয়ানা হয়ে যায় বেলাবেলি। দু' ক্রোশ পাঁচ ক্রোশ জঙ্গলের পথে হেঁটে বাড়ি পেঁছে যায়। এণ্ডুলি পিঠা খায়। গুলগুলা খায়। যাদের অবস্থা বিশেষ ভাল তাদের বাড়ি পোড়-পিঠাও তৈরী হয়।

নানা হিসাব-নিকাশের ঝামেলা থাকাতে দুর্গা আগের দিন যেতে পারেনি। অষ্টমী পুজোর দুপুর অবধিও তার কাজ মিটল না। যখন তার কাজ মিটল খাওয়া-দাওয়ার পর, তখন বেলা দুটো বেজে গেছে।

দুর্গা এসে আবদার করল, ঋজুবাবু, আমাকে একটু জীপে করে বাড়ি পেঁছে দেবে? নইলে আমার যাওয়াই হবে না। রাতের আগে পেঁছতে পারব না। ও রাস্তায় সন্ধ্যের পর লোকজন যায় না—বড় গভীর জঙ্গল।

লবঙ্গীতে বহুদিন যাওয়া হয়নি। লবঙ্গীর জঙ্গলের গভীরতা ও ভয়াবহতা আমাকে বড় টানে।

দুর্গার বাড়ি অবশ্য লবঙ্গীতে নয়। ওর বাড়ি পম্পাশর আর লবঙ্গীর মাঝামাঝি এক ছোট গ্রামে।

দুর্গাকে তৈরী হয়ে নিতে বলেছিলাম।

গগন আর পাইকারা এসে বলল যে, ওরাও দুর্গাকে পেঁছতে যাবে। ওরা দুজনেই বাড়ির ছোট ছেলে, তাই অষ্টমী পুজোতে ওদের উৎসাহ নেই।

দুর্গা বাড়ি যাবে বলে তৈরী হয়ে এল। সাজিমাটিতে কাচা ধুতি, মালকোঁচা মারা, গায়ে হলদে-রঙা হাফ সার্ট। বুক পকেটে ইয়া মোটা নোটবুক, তাতে রাজ্যের কাঠের হিসাব ও অনেক অশ্লীল গান-টান লেখা আছে। এতদিন পর বাড়ি যাচ্ছে, বউকে গিয়ে শোনাবে। পকেট থেকে একটা লাল-রঙা প্লাষ্টিকের চিরুনি উঁকি মারছে। আজ গন্ধতেল দিয়ে চান করেছে দুর্গা। হাতে ঝোলানো বেগুনে-রঙা আলোয়ান। প্রয়োজনে গায়ে দেবে।

ওরা তিনজনেই পিছনে বসল। সামনের সীটে আমার ব্যাগটা আর

রাইফেলটা রইল। ওয়াটার-বট্‌লটা ওরা পিছনে নিল। ভাল করে জমিয়ে পাইপটা ধরিয়ে, টুপিটাকে কান অবধি টেনে নামিয়ে দিয়ে রওয়ানা হওয়া গেল।

আজ সকাল থেকেই মেঘলা করেছে। সাঁই সাঁই করে হাওয়া দিচ্ছে একটা। সূর্যের মুখ দেখা যায়নি ভোর থেকেই।

পুরুনাকোট থেকে পম্পাশরের পথে ডানদিকে অনেকটা চষা জমি। তার পাশ থেকেই শুরু হয়েছে গভীর জঙ্গল। এক ঝাঁক বড়্‌কি ধনেশ (কুচিলা-খাই, (গ্রেট ইণ্ডিয়ান হর্ণবিলস্‌) গ্লাইডিং করে ডানা-না-নাড়িয়ে ভেসে ভেসে উড়ে চলেছিল পাহাড়ের খোলে, ওদের ডেরার দিকে। স্টীয়ারিং-এ হাত রেখে আমি ঐ দিকে তাকিয়েছিলাম। ওদের এই নিস্তরঙ্গ উড়ে চলা, আকাশের ক্যানভাসে, ঘন সবুজ জঙ্গলের দিগন্তরেখার পটভূমিতে দারুণ এক স্তব্ধতা আনে। মনের মধ্যের কানাকানি করা ঢেউগুলো, চল্‌কে-পড়া আবেগগুলো সব যেন মন্ত্রবলে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।

আমি ঐ দিকেই চেয়েছিলাম, এমন সময় দুর্গা পেছন থেকে আমার জার্কিনের হাতা টেনে দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ব্রেকে পা দিয়ে জীপটাকে থামালাম।

দুর্গা আঙুল দিয়ে জঙ্গলের কাছ-ঘেঁষা একটা পাতা-ঝরা বড় গাছের দিকে দেখাল, তারপর বলল, দেখো বাবু, হর্‌হরা ফুটে আছে।

তাকিয়ে দেখলাম, তাই-ই; পাতা-ঝরা গাছটার ডালে ডালে কম করে পঞ্চাশটা হরিয়াল (গ্রীণ পিজিয়ন) বসে আছে। দূর থেকে তাদের কালো কালো ফুলের মতই দেখাচ্ছে। উপমাটা খারাপ দেয়নি দুর্গা। বলেছে, হর্‌হরা ফুটে আছে।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, আমি জীপের এঞ্জিনে স্টার্ট করে গীয়ার বদলেছি. এমন সময় দুর্গা অত্যন্ত উষ্মার গলায় বলল, চললে কোথায়? মারবে না?

আমি হাসলাম. বললাম, এই রাইফেল দিয়ে কি হরিয়াল মারা যায়?

দুর্গা বলল, কেন? বন্দুকও তো আছে।

শুধালাম, কোথায় বন্দুক?

দুর্গা একগাল হেসে বলল, এই যে! বলেই. তার আলোয়ানের আড়াল থেকে চামড়ার ল্যার্ম্বস্‌-লেগে মোড়া আমারই চব্বিশ ইঞ্চি ব্যারেলের শট্‌-গানটা বের করল। গুলির বাক্সও বের করল। তারপর হেসে বলল, তুমি রাগ করবে বলে আগে বলিনি।

আমি হেসে বললাম, তুমি এক নম্বরের চোর।

দুর্গা বলে উঠল, এই-ই তো হয়। যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। এই-ই পৃথিবীর নিয়ম।

অগত্যা অনুচরবর্গের প্ররোচনায় নামতে হলো। নামলাম বটে, কিন্তু ঐ ন্যাড়া গাছের সব ক'টা পাখি এদিকেই দিব্যদৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে সে গাছের কাছে আমি তো কোন্ ছার, কোনো গুবরে পোকার পক্ষেও পৌঁছনো মুশকিল। সেই গাছ ও আমাদের মধ্যে চষা ক্ষেত। বিন্দুমাত্র আড়াল নেই যে, আড়ালে আড়ালে যাব। তাই পিছনে হেঁটে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেলাম, তারপর আস্তে আস্তে ওদের পিছন দিয়ে গিয়ে গাছটার কাছে পৌঁছলাম।

পাখিগুলো বেশ বড় সাইজের ছিল। ওরা কারো কাছে দীক্ষা-টিক্ষা নিয়েছিল কিনা জানি না, এই শান্ত বিকেলে ওরা নিষ্কম্প অনড় হয়ে বসেছিল। হয়ত কোন মন্ত্র-টন্ত্র জপ করতে থাকবে।

ভাল করে নিশানা নিয়ে দু'ব্যারেলে দুটি চার নম্বর ইণ্ডিয়ান অরড্যান্স্ ফ্যাক্টরীর গুলি পুরে দেগে দিলাম।

ঝর্ঝর্ করে ফুল পড়ার মত ওদের হলদে-সবুজ পালক উড়িয়ে ছ'ছটা পাখি নীচে পড়ল। বাকিগুলো একই সঙ্গে ওদের শক্ত ডানায় পটাপট্ ঝটাঝট্ শব্দ করে জঙ্গলের গভীরে উড়ে গেল।

গুলি করেই ব্রীচটা খুলে দু'পা এগিয়ে আমি ফাঁকায় নেমেছি আর দেখি কি, তিন শ্রীমান পড়ি-কি-মরি করে ধুতি উড়িয়ে চুল নাড়িয়ে একই সঙ্গে দৌড়ে আসছে গাছটার দিকে।

ওরা পাখিগুলো কুড়িয়ে নিল দেখতে দেখতে।

দুর্গা আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলল, এব্বে কিচ্ছি হেল্বা।

অর্থাৎ এবার কিছু হল।

আমরা জীপের কাছে ফিরে এলাম। আমি ব্যারেল দুটো উঁচুতে তুলে ফুঁ দিচ্ছি ধুঁয়ো বের করার জন্যে, এমন সময় দুর্গা একেবারে আমার ঘাড়ে পড়ে বলল, মারন্তু আইজ্ঞাঁ; মারন্তু। চালি গল্বা।

উপরে তাকিয়ে দেখি, এক ঝাঁকে পাঁচটি ছোট্কি ধনেশ উড়ে আসছে মাথার উপর দিয়ে।

ওরকম প্ররোচনার মধ্যে বুদ্ধির ঠিক থাকে না। কখন যে ডান ব্যারেলে আর একটা চার নম্বর ছর্রা ফেলে ব্যারেল উঁচিয়ে গুলি করে দিয়েছি নিজেও জানি না। দুটো ধনেশ মাথা-নীচে পা-উপরে করে মাটিতে পড়ে গেল জীপের কাছেই। অন্য তিনটে গুলির শব্দে হাওয়ায় একটু নেচে উঠেই গতিটা পরি-

বর্তন করে এবং একই সঙ্গে গতিটা দ্রুততর করে ডানা চালিয়ে উড়ে গেল।

অপকর্মটা করে ফেলে আমি রাগ ঝাড়লাম দুর্গার উপরে।

বললাম, তুমি ভেবেছ কি? আমি কি তোমার বাঁদর যে ইচ্ছামত নাচাবে? যা মারতে বলবে, তাই-ই মারব? আমরা কি শিকারে বেরিয়েছি? না তোমাকে পৌঁছে দিতে বেরিয়েছি?

দুর্গার মুখটা কালো হয়ে গেল।

দুর্গার সেই সদাহাস্যময়তা মুছে গিয়ে এক আশ্চর্য দুঃখে ছেয়ে গেল তার মুখ।

দুর্গা বলল, এতদিন পরে বাড়ি যাচ্ছি ঋজুবাবু। ছেলেমেয়েগুলো আমার গলা শুনতে পেয়েই বাপ্পা, বাপ্পা বলে দৌড়ে আসবে। বলবে, কি এনেছ বাবা. কি এনেছ আমাদের জন্যে? আমার ছোট ছেলেটা মাংস খেতে বড় ভালোবাসে। এ ছাড়া আর কি নিয়ে যেতে পারি ঋজুবাবু? এই তোমার-মারা পাখি নিয়েই যাব। এ ছাড়া আর কিছু নেওয়ার সাধ্য আমার নেই।

তারপর বলল, তুমি রাগ করলে?

আমার খুব লজ্জা হলো। দুঃখও হলো। আমি দুর্গার পিঠে হাত রেখে বললাম, কিছু মনে কোরো না দুর্গা।

জীপ চালাতে চালাতে আমি ভাবছিলাম শহরের পশুপাখি-দরদী আর্ম-চেয়ার্ কনসার্ভেটররা যে সব বাণী দেন, এবং যা পরদিন নামী-নামী ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, সে বাণী আমি বুঝতে পারি না।

যে-দেশে মানুষ না-খেতে পেয়ে মরে রোজ-রোজ, যে-দেশে প্রচণ্ড শীতের রাতে একটু আগুন সম্বল করে একবার বুক আর একবার পিঠ ফিরিয়ে বনে-পাহাড়ে এরা শুয়ে থাকে, যে-দেশের মানুষের গায়ের আগুনে-পোড়া চামড়া পরতে পরতে সাপের খোলসের মত খসে পড়ে চৈত-বৈশাখ মাসে, সে-দেশে অন্য দেশের নিয়ম খাটে না। এরা ড্রেসড্ চিকেনের নাম শোনেনি। লীন মিট্ কাকে বলে এরা জানে না। ওরা জানে শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায় বেঁচে থাকাটাই, নিছক বেঁচে থাকাটাই একটা মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা—যা মৃত্যুর চেয়েও নির্মম।

আমার মনে হয় ওদের অনেক অপরাধই ক্ষমা করা উচিত। লজ্জার সঙ্গে, ক্ষোভের সঙ্গে আমাদের নিজেদের প্রতি এক চরম ঘৃণার সঙ্গে ওদের ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।

আজ শেষ বিকেলে, অনেক অনেকদিন পর কতগুলো পাখি হত্যা করে আমার খুব আনন্দ হল। মনে হল, অনেকদিন পর একটা পুণ্যকর্ম করলাম।

জগন্নাথপুর পৌঁছে চায়ের দোকানে ওদের গুলগুলা আর বিড়ি-বড়া খাওয়ালাম পেট ভরে। চাও খেলাম সকলে। তারপর দুর্গা অখয়েরী গুন্ডি-মোহিনী পান গোটাকয় একসঙ্গে মুখে পুরে বলল, চালন্তু ঋজুবাবু।

গগন পিছন থেকে টিপ্পনী কাটল আস্তে আস্তে, আজ রাতে বুড়ির প্রাণ যাবে। ছ'মাসের আদর একদিনে খাবে।

শুনলাম, দুর্গাও ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, কে বলে রে বুড়ি আমার বৌকে? তোদের মত পাঁচ-সাতটা ছোকরা একসঙ্গে মিলেও কায়দা করতে পারবি না। সব দাঁত বের করে পড়ে থাকবি। বুঝিলু?

ওরা হাসল, আর ঘাঁটাল না দুর্গাকে।

পম্পাশরের কাছে আসতেই বেলা পড়ে এল। আর মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

ডানদিকে পম্পাশরের গ্রাম রয়ে গেল। খড়ের ঘর, কয়েক গুঁট চষা-জমি, তালগাছ; ইতস্তত ঘরে-ফেরা গরু-বাছুরের দল; এই-ই সব। গরুদের পায়ের খুরে খুরে কাঁচা রাস্তার মিষ্টি মিহি ধুলো উড়ছিল, পশ্চিমাকাশ থেকে শেষ সূর্যের গোলাপি ও বেগুনে আলো এসে পড়ে সে ধুলোর মেঘে এক সুন্দর রামধনুর সৃষ্টি করেছিল।

গ্রাম পেরোনোর পর আবার গভীর জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লাম আমরা। এ পথেও জীপ ছাড়া এবং শক্তিশালী ট্রাক ছাড়া অন্য কোনো গাড়ির পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

বেশ কিছুক্ষণ যাওয়ার পর দূর থেকে দুর্গা আঙুল দিয়ে দেখাল, ঐ যে।

সূর্য ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমাকাশে তখনও ফিকে একটা সিঁদুরে আভা মাখানো ছিল।

দুর্গা যেখানে আঙুল দিয়ে দেখাল, সেখানে কোনো গ্রামের চিহ্ন দেখা গেল না—শুধু পথের পাশে পাশে কতগুলি বাঁশের বেড়া ও মধ্যবর্তী ক্ষেত ছাড়া।

এখানে জীপটা দাঁড় করিয়ে দুর্গার নির্দেশে হর্নটা একবার বাজালাম। হর্নটা থেমে যেতেই আসন্ন রাতের বার্তাবাহী ঝিঁঝিদের একটানা ডাক কানে এল।

দুর্গা জীপ থেকে নামতে-না-নামতেই খালি গায়ে লাল শাড়ি পরা, নাকে পেতলের নথ পরা একটি মেয়ে ও তার পিছনে গামছা পরা একটা বছর চারেকের ছেলে, বাপ্পা, বাপ্পা, বাপ্পা, বলতে বলতে বেড়ার দরজা খুলে দৌড়ে এল।

বেড়ার পাশে ফণীমনসার ঝোপ ছিল, দৌড়ে আসতে গিয়ে ফণীমনসার কাঁটায় মেয়েটির শাড়ির আঁচল আটকে গেল। ও তবু দৌড়ে আসছিল, দৌড়ে আসতেই কাপড়টা কাঁটার উপরেই রয়ে গেল আর দুর্গার লালচে উলঙ্গ মেয়ে, লাল মাটি গায়ে মেখে, কন্দমূলের ক্ষেত থেকে দৌড়ে এসে দুর্গার কোলে ঝাঁপিয়ে উঠল। তার ভাই, দিদির বস্ত্রত্যাগ দেখে প্রথমটা কি করবে ভেবে পেল না। পরক্ষণেই এক হাতে সপ্রতিভতা কুড়িয়ে নিয়ে এবং অন্য হাতে দিদির শাড়িটাকে কাঁটা থেকে ছাড়িয়ে এনে গোল্লা পাকিয়ে বাবার কোলে-চড়া দিদির দিকে ছুঁড়ে দিল।

ওখানে যত জন আমরা ছিলাম, তার মধ্যে দিদির নগ্নতায় ওই সবচেয়ে বেশী লজ্জিত হয়েছিল; এমন কি ওর দিদির চেয়েও বেশী। শাড়িটা গোল-পাকিয়ে ছুঁড়ল বটে, কিন্তু সেটা ছড়িয়ে গিয়ে দুর্গা ও তার মেয়ের মাথায় ও মুখে এসে পড়ে, মুখে ও মাথায় কেমন জড়িয়ে গেল।

মেয়ে ও বাবা একসঙ্গে দু'জনে অনেকক্ষণ চেষ্টা করে তারপর সেই শাড়ির জাল থেকে মুক্ত হল। ওদের এই হেনস্থা দেখে গগন আর পাইকারা হি-হি করে হাসতে লাগল। সেই হাসিতে আমরা সকলে, এমনকি দুর্গার সীরিয়াস-টাইপের চার বছরের ছেলেও যোগ দিল।

দুর্গা একটা ধনেশ ও তিনটে হরিয়াল গগনদের জন্যে জীপের মধ্যে রেখে বাদবাকী পাখিগুলো যখন ওর ছেলেমেয়েদের দেখাল তখন আনন্দে উত্তেজনায় ওরা ফেটে পড়ল। পাখিগুলো নিয়ে ওরা লাফাতে লাগল। মৃত ধনেশটার ঠোঁট থেকে রক্ত ছিট্‌কে দুর্গার উলঙ্গ মেয়ের সারা গায়ে মাখামাখি হয়ে গেল। তবু ও লাফাতে লাগল।

দুর্গা বলল, একটু নামবে না বাবু? একটু এণ্ডুলি পিঠা খেয়ে যাও। তারপর গগনদেরও বলল নামতে।

গগন পিছন থেকে বলে উঠল, আমাদের বেলা এণ্ডুলি পিঠা আর তোমার নিজের বেলা...।

দুর্গা হেসে উঠল, বলল, ষড়া।

গগন বলল, জগন্নাথপুরে অনেক খেয়েছি। পেট ভরে গেছে। আজ আর পিঠা খাব না। তার চেয়ে ক'টা কন্দমূল উপড়ে দে দুর্গাভাই, ডেরায় গিয়ে পুড়িয়ে খাব।

এই প্রস্তাবে দুর্গা রাজী হয়ে গেল।

তারপর বাবা আর ছেলে মিলে কন্দমূলের ক্ষেতে গিয়ে কন্দমূল উপড়াতে লাগল।

আমি গগনদের বললাম, তোমরাও গিয়ে হাত লাগাও, অন্ধকার হয়ে গেছে, বাচ্চারা কি এখন পারবে?

গগন ও পাইকারা নেমে গেল।

জীপের মাড্‌গার্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পাইপটা ধরালাম। এখন আলো একেবারে নিভে গেছে। পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারায় চোখ পড়লেই তোমার কথা মনে হয় আমার। বিশ্বাস করো; চিরদিন মনে হয়েছে। আমার মনোজগতে সমস্ত স্নিগ্ধতার শান্তির সংজ্ঞা এই সন্ধ্যাতারা; তুমি। আমার মনের সন্ধ্যা-তারাটা হারিয়ে গেল চিরদিনের মত। এখন অন্ধকার, ভয় ভয়, শীত শীত, ঝিঁঝি-ডাকা চাপ চাপ ভিজে ভিজে অন্ধকার আমার চারপাশে। এ জীবনের দিগন্তে আর কখনও সন্ধ্যাতারা উঠবে না।...

কন্দমূলগুলো জীপের পিছনে ঢেলে নিয়ে, হেডলাইট জ্বালিয়ে দিয়ে যখন ঘুরোলাম জীপটা, তখন দেখলাম দুর্গা আর তার দুই ছেলেমেয়ে একই সঙ্গে আমাদের সকলকে হাত জোড় করে নমস্কার করে দাঁড়িয়ে আছে বেড়ার পাশে।

আমরাও প্রতিনমস্কার করে এগিয়ে চললাম।

দুর্গারা অন্ধকারের মধ্যে কন্দমূলের ক্ষেতে ঢুকে গিয়ে, টেনে বেড়ার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বড় বড় পাথর চাপা দিয়ে রাখল। হরিণ, শুয়োর বা শজারু যাতে ঠেলে ঢুকতে না পারে।

রাস্তাটা বেশ খারাপ। হেডলাইট জেবলে সেকেন্ড গীয়ার, ফার্স্ট গীয়ারে চালিয়ে আসছি। দুর্গার বাড়ি থেকে প্রায় মাইল দেড়েক এসেছি, সামনেই একটা হেয়ার-পিন বেন্ড দেখা গেল, বাঁকটা ঘুরতেই দেখলাম একদল হাতী পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে সামনে। হাত কুড়ি-পঁচিশ দূরে হবে। প্রায় দশ-পনেরোটা হাতী আছে দলে।

সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক করলাম।

হেডলাইটটা ডিপার করা ছিল, ওটাকে ডিমার করে দিলাম, পাছে হাতীদের চোখ ধাঁধালে হাতীরা রেগে যায়; সেই ভয়ে।

হাতীর দল কোনরকম ভ্রূক্ষেপই করল না আমাদের প্রতি। বরং একটা বড় দাঁতাল সোজা বড় বড় পা ফেলে জীপটার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল।

বাঁকের মুখে জায়গা এত কম ছিল যে জীপ ঘুরিয়ে ফিরে যাবার উপায়ও ছিল না।

হাতীটা আরো কাছে চলে আসতেই আলো নিবিয়ে দিয়ে, জীপের স্টার্টও বন্ধ করে দিলাম।

কিছুক্ষণ পর আর কিছু দেখা গেল না। পুরো দলটা জীপটাকে ঘিরে

ফেলল।

আড়চোখে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম গগন আর পাইকারা মরা-পাখি আর কন্দমূলের স্তূপের উপর বডি-থ্রো দিয়ে নট্-নড়ন-চড়ন-নট্-কিচ্ছু হয়ে পড়ে আছে। আমার বডি-থ্রো দেবার জায়গা থাকলে আমিও দিতাম। কিন্তু স্টীয়ারিং-এ যে বসে আছি। হাতে স্টীয়ারিং, এক পা ক্লাচে, অন্য পা ব্রেকে আল্‌তো করে ছুঁয়ে রেখেছি।

আমাদের চারপাশে তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। যেদিকে তাকাই কিছুই দেখা যায় না। চতুর্দিকে কালো কালো পাহাড়। শুধু দীর্ঘ ফোঁস্-ফোঁস্ আওয়াজ হচ্ছে। হঠাৎ বনেটের উপর কি একটা শব্দ হল। বুঝলাম একটা হাতী শুঁড় দিয়ে বনেটটা ছুঁল। তারপর বাঁদিকের সীটে রাখা আমার রাইফেলটার নলে একটা শুঁড় এসে লাগল। লাগতেই, রাইফেলটা সীটের রডের উপর ঝন্‌ঝন্ শব্দ করে ধাক্কা খেয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল জীপের ভিতরেই। সঙ্গে সঙ্গে অতর্কিতে প্যাঁ-এ-এ-এ করে কানের কাছে ডেকে উঠল হাতী। ভয়ে পিলে চমকে উঠল। কিন্তু কিছুই করণীয় নেই।

ঐ বিজাতীয় রাইফেল শুঁকে এবং ধাতব শব্দ শুনে তারা কিছুক্ষণের জন্যে একটু সরে গেল।

আমার মনে হল, এই বেলা কিছু একটা করা দরকার। নইলে এরা দয়া করলে সারারাত এখানে পড়ে থাকতে হবে। আর যদি দয়ার মাত্রাটা আর একটু বাড়ে তাহলে তালগোল পাকিয়ে সারা জীবনও এখানে শুয়ে থাকতে হতে পারে।

হাতীগুলো একটু সরে যেতেই, একটু দূরে দূরে চলে যেতেই আমি একই সঙ্গে এঞ্জিন স্টার্ট করে এবং হেডলাইট জ্বালিয়েই হর্ণ বাজালাম। সঙ্গে সঙ্গে এ্যাকসিলারেটরে পা দিয়ে খুব জোরে রেস্ করালাম এঞ্জিনকে। তখনও পথের ওপর সামনেই দাঁড়িয়েছিল দুটো হাতী। ফার্স্ট গীয়ারে ফেলে খুব রেস করে এঞ্জিনে প্রচণ্ড গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলে এবং জোর জোর হর্ণ বাজিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে অভাবনীয় এক কাণ্ড ঘটল। চতুর্দিকের হাতীগুলো চার-পা তুলে পড়ি-কি-মরি করে রাস্তার বাঁ দিকের জঙ্গলে গাছপালা ভেঙে মড়মড় শব্দ করে দৌড়ে গেল।

ফাঁক পেয়েই, যাকে বলে 'টিকিয়া উড়ান্' চালানো, তেমন করে টিকি উড়োনো স্পীডে জীপ চালিয়ে অন্তত আধমাইলটাক গিয়ে জীপ থামালাম। থামিয়ে, গগনের কাছে হাত বাড়িয়ে ওয়াটার বটল্ চাইলাম জল খাব বলে।

গগন ওয়াটার বটল্‌টা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ফিক্‌ ফিক্‌ করে হাসতে লাগল।

আমার তখনও ভয় কাটেনি। বললাম, হাসছিস যে বড়?

গগন তবুও হাসতে লাগল।

আবার যখন শুধোলাম, তখন গগন হাসতে হাসতে বলল, পাইকারা হিসি করে দিয়েছে।

আমি ধমক দিয়ে বললাম, কি ফাজলামি করছিস?

গগন সীরিয়াসলি বলল, শালা আমার একেবারে মুখের উপর...।

আমি চেপে গেলাম।

বললাম, এ কথা যেন ডেরার কেউ না জানে।

পাইকারার কোনই দোষ হয়নি। ও যা করেছে তা আমি নিজেও করতে পারতাম। গগনও করতে পারত।

ভাবছিলাম যে, সাহসের এবং ভয়ের কোনো অনড় সংজ্ঞা নেই। একই লোক বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রকমের সাহসের পরিচয় দেয়। খুব ভীতু লোক সময়ে সময়ে খুব সাহসিকতার কাজ করে ফেলে, পাইকারার মত সাহসী লোকও কখনও কখনও খুব ভয় পেয়ে যায়। জীবনে যাঁরাই একাধিকবার ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন তাঁরাই জানেন যে, সাহস ব্যাপারটা কারোই চিরদিনের কুক্ষিগত নয়। সাহসের রেখা, যে-কোন লোকেরই সাহস, অক্ষয় তৃতীয়ার দিনের বন্‌তে-থাকা কাসুন্দীর মত বুকের হাঁড়িতে বাড়ে কমে। কখনও তা ফেঁপে ওঠে; কখনও বা নেমে যায়।

আজ পাইকারার কপাল খারাপ, তাই আমাকে বা গগনকে আশ্রয় না করে ভয়টা আজ পাইকারাকে আশ্রয় করেছিল।

জীপটা স্টার্ট করে আবার রওয়ানা হবার পর গগন বলল, ঋজুবাবু, তুমি যে তখন এমন হঠাৎ গাড়ি স্টার্ট করলে, হাতীগুলো যদি ক্ষেপে গিয়ে এসে মেরে দিত?

আমিও সে কথা তখন থেকে ভাবছিলাম। বললাম, আমার অন্যায় হয়েছে। করতে পারত হাতীরা তা। উচিত ছিল আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা, হাতীগুলো নিজেরাই হয়ত একসময় চলে যেত।

গগন বলল, আমারও কিন্তু খুব ভয় লেগেছিল। কিন্তু পাইকারাই কাণ্ড করল। ঈসস্‌ কোনো মানে হয়?

বলেই, ওয়াটার-বটল্‌ খুলে জীপের পিছন দিয়ে মুখ বের করে মুখ ধুতে লাগল। আর কেবলি বলতে লাগল, এটা কি করলি তুই? হ্যাঁরে পাইকারা ভাই এটা তুই কি করলি?

॥ ৬ ॥

কয়েকদিন থেকেই এর-ওর মুখে শুনছি যে একটা বাইসন গুণ্ডা হয়ে গেছে। হটবাবু কাল রাতে খাওয়ার সময় বলছিলেন যে, শ্যামলবাবুর কাবাড়িরা যখন কটরঙের রাস্তায় সকালে কাজ করছিল তখন বাইসনটা নাকি তেড়ে আসে। ওরা সকলে তাড়াতাড়ি গাছে উঠে পড়ে। গদাধর বলে একজন উপর থেকে টাঙ্গি ছুঁড়ে মারে। টাঙ্গীটা ঘাড়ের কাছে বেশ অনেকখানি কেটে বসে যায়, তারপর কাঁধ ঝাড়া দিতেই সেটা খুলে পড়ে। ওখান দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে এবং বাইসনটা তেড়ে এসে গদাধর যে গাছে বসেছিল সেই গাছে মাথা দিয়ে এত জোরে ঢুঁ মারে যে, সমস্ত গাছ ঝরঝর করে পাতা ঝাঁকিয়ে নুয়ে যায় উল্টোদিকে। ভয়ার্ত গদাধর গাছ থেকে পড়ে যায়। পড়ে যেতেই, অন্যান্য সব কাবাড়িদের চোখের সামনেই গল্বটা (বাইসন) গদাধরকে শিং দিয়ে, পা দিয়ে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে রক্ত-মাংসর একটা তাল পাকিয়ে ফেলে রেখে চলে যায়। গল্বটার শিং-এ গদাধরের নাড়িভুঁড়ি ঝুলতে ঝুলতে যায়।

গগন বলছিল, রেঞ্জ অফিসের একজন ফরেস্ট গার্ডকেও তাড়া করেছিল বাইসনটা।

এ ক'দিন বাইসনটার কথাই ঘুরছে সকলের মুখে মুখে। সেজন্যে সকালে চা-টা খাওয়ার পর যখন অনিবাবুর সঙ্গে দেখা করব বলে শ্যামলবাবুর তৈলার দিকে বেরোলাম, তখন ফোর-ফিফটি ফোর-হাণ্ড্রেড ডাবল-ব্যারেল রাইফেলটার দু' ব্যারেলে দুটো হার্ড-নোজড় গুলি ফেলে ওটা কাঁধে নিয়েই বেরোলাম। সাবধানতার মার নেই। খালি হাতে বাইসনের গুঁতো খেয়ে মরে খবরের কাগজের হেডলাইন হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না।

যে কোনো যূথবন্ধ জানোয়ারই 'রোগ' বা 'গুণ্ডা' হয়ে গেলে মুশকিল। এককালীন ভালোবাসার পাত্রদের দ্বারা বিতাড়িত, সাম্রাজ্যচ্যুত, অপমানিত, আহত অবস্থায় এদের মাথার ঠিক থাকে না। এরা সামনে যাকে পায়, তারই উপর উষ্মা প্রকাশ করে। যে-রাগের, যে-দুঃখের কোনো পরিণতি নেই, সেই গন্তব্যবিহীন অনুভূতি ওরা অন্যদের উপর অসম্মানের সঙ্গে, ঘৃণার সঙ্গে চাপাতে চায়। ফলে, যে-ক্ষত নিয়ে ওরা দল থেকে একসময় বেরিয়ে আসে, সেই

ক্ষতর সংখ্যাই বাড়ে, শুধু বাড়তেই থাকে; যতক্ষণ না ওরা সব শারীরিক দুঃখ, সব মানসিক গ্লানির ওপারে কোনো স্তব্ধ শান্তির ঘাসের মাঠে গিয়ে পৌঁছয়।

দূর থেকে অনিবাবুকে দেখতে পেলাম।

রাস্তার দিকে পিছন ফিরে লুঙি পরে, খালি গায়ে, কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে তেল মাখছেন।

অনেক বছর পর অনিবাবুকে দেখলাম। দেখলে চেনা যায় না। চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে। ছ'ফিট দীর্ঘ শরীরটা বয়সের ভারে যেন বেঁকে হ্রস্ব হয়ে গেছে।

কুয়োতলার পাশের পেঁপে গাছে বসে লাল-টাগরা বের করে দাঁড়-কাক ডাকছে কা—খা—খা—কা করে। খড়ের গাদার উপর একটা চিতাবাঘের বাচ্চার মত দেখতে বেড়াল শুয়ে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। কে জানে, ওর বাবা হয়ত কোনো ছোট্ট চিতাবাঘ, যে ওর ঢঙি বেড়ালনি মায়ের মধ্যে পেটের খাদ্য না খুঁজে অন্য কোনো খাদ্যের সন্ধান করেছিল। কোনো ভর-দুক্‌কুরের বাঁশবনের সেই অসম অসহিষ্ণু মিলনের ফল, এই পিট্‌পিটে-চোখ, মিট্‌মিটে-বুদ্ধি বেড়াল।

একটি মেয়ে কুয়োতলায় বালতি ডুবিয়ে জল তুলছিল, তার খালি শরীরে একটা গেরুয়া শাড়ি জড়ানো। যতবারই সে বালতি ডুবোচ্ছিল, ডুবিয়ে বালতি নাড়িয়ে জল ভরছিল কুয়োর মধ্যে, ততবারই দুটি ডাঁশা পেঁপের মত ফিকে হলুদ তার উন্মুক্ত বুক দোলা খাচ্ছিল।

অনিবাবুর সেদিকে চোখ ছিল না।

তিনি ডান হাতে মাথার তালুতে তেল থাবড়াতে থাবড়াতে দূরে টৈলার শেষে যেখানে জঙ্গল ঘন হয়ে রয়েছে, সেদিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে চেয়েছিলেন। জীবনে তিনি বোধহয় দু'লক্ষ বার এমনি করে মাথায় তেল লাগিয়ে চান করেছেন, কিন্তু আজকের দুপুরের এই উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে, বাঁশবনে কটকটি আওয়াজের সঙ্গে, বাঁশপাতার দীর্ঘ বুককাঁপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে এর আগে অনিবাবু আর কখনও এমন একাত্ম হননি। একটা মারাত্মক স্ট্রোক হবার পরও তিনি শরীরকে মোটে পাত্তা দেননি। "জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে" তা তিনি জানেন। আগে উনি বলতেন, আমাকেই শুনিয়ে যে, আজকালকার ছোঁড়ারা মাইকেল পড়েনি; পড়ে না। উনি নিশ্চয়ই পড়েছিলেন। মাইকেল আওড়াতেন তিনি কথায় কথায়।

কিন্তু এই যে নীল আকাশে চিল-ওড়া, বাঁশবনে ফিসফিসানি তোলা,

চারিদিকে সোনালি রোদ্দুরে ভরা আশাবাদী দুপুর, এ দুপুর তাঁর জন্যে কোনো আশাই আর অবশিষ্ট রাখেনি। যুবতীর স্তন, কচি পাঁঠার মাংস, মহুয়ার মদ, ক্যাশ-বাক্সের টাকা এ সব কিছুই, কোনো কিছুই আর তাঁর মনকে আবিষ্ট করে না। তাঁর জীবনের অবশিষ্ট অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি কুয়োতলার পাশের পাথরগুলোর আড়াল থেকে ডেকে-ওঠা তক্ষকের ডাকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তিনি বুঝতে পারেন, সর্বক্ষণ বুঝতে পারেন, তাঁর যাবার সময় হয়েছে। এক-পা বাড়িয়েই আছেন উনি। সবসময়। এমন একদিকে পা বাড়িয়ে আছেন উনি, যেদিকের ক্ষেত-খামার, জন্তু-জানোয়ার, পাখপাখালি সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞান নেই তাঁর। আজকাল, এই অল্প কিছুদিন হল মাঝরাতে অনিবাবু কেঁপে কেঁপে ওঠেন—শীতে নয়; ভয়ে। এমন একটা ভয়ে, যে-ভয়ের কোনো প্রতিবিধান নেই। যে-ভয় শুধু চিতাতেই ভস্মীভূত হয়।

আমাকে দেখতে পেয়েই অনিবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন।

এক আশ্চর্য স্বার্থহীন সরল আনন্দের হাসিতে তাঁর মুখ ভরে উঠল। সামনের তিনটে দাঁত পড়ে গেছে অনিবাবুর। কালো কালো মাড়ি দেখা যাচ্ছে।

অনিবাবু বললেন, আরে, কি খবর ঋজুবাবু? কেমন আছেন? কত দিন পরে!

আমিও হাসলাম। বললাম, সত্যি! কতদিন পরে আপনাকে দেখলাম। আপনি বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন। বোকার মত বলে ফেললাম আমি।

অনিবাবু শুকনো গলায় বললেন, হ্যাঁ। আপনিও একদিন হবেন।

তারপর বললেন, এক মিনিট বসুন বারান্দায়। আমি চানটা সেরে নিই।

শুধোলাম, শ্যামলবাবু কোথায়?

আবার কোথায়? জঙ্গলে গেছে। ওর কী যে কাজের নেশা। পা-টাতে এখনও জোর পায় না, তবু না গেলেই নয়। বললাম রেস্ট নে আরো ক'দিন। কিন্তু শুনছে কে? তার উপর গদাধরটাকে গন্ব মারল। না গিয়েও উপায় নেই বেচারার।

অনিবাবু কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে হুপুস্-হুপুস্ করে চান করতে লাগলেন।

রাইফেল থেকে গুলি দুটো বের করে, রাইফেলটা মাচার উপরে শুইয়ে মাচাতেই বসলাম আমি।

সত্যি! এ অনিবাবুকে চেনা যায় না। লম্বা তেল চুক্‌চুক্ ময়াল সাপের মত চেহারা ছিল। মাথা ভর্তি কালো চুল; টেরী বাগানো। সবসময় কোঁচকানো ধুতি, পায়ে সাদা পাম্প-শু; এই জঙ্গলেও। আদ্দির পাঞ্জাবি। আতরের গন্ধে ভুরভুর করতেন সে সময়। রঘুবাবু একদিন অনিবাবুকে বলেছিলেন

মনে আছে, "ছুছুন্দরকা শির পর চামেলিকা তেল"। তখন খুব ভাল কীর্তন গাইতেন উনি: কত কত রাতে আমরা টুম্বেকার বাংলোর বারান্দায় বসে ওঁর 'নৌকা বিলাস' শুনেছি।

অনিবাবুর বাড়ি আছে ভুবনেশ্বরে। সেখানে তাঁর স্ত্রী থাকেন আর এক-মাত্র সন্তান—তাঁর মেয়ে। মেয়েটি পড়াশোনায় ভালো। শুনেছি, দেখতেও ভালো। ভুবনেশ্বরেই যেন কোন্ সরকারী অফিসে কাজ করছেন এখন। ভালো মাইনেও পান।

মাত্র তিনজনের সংসার। তবুও কেন যে এই বনে-বাদাড়ে শরীরের এই অবস্থা নিয়ে পড়ে আছেন এখানে অনিবাবু, তা উনিই জানেন। এখন আর উনি ঠিকাদারী করেন না। নিজের পেট চালিয়ে নেবার জন্যে—টুক্‌টাক্ করেন। অঙ্গুল থেকে চা কিনে এনে এখানে এবং টিকরপাড়ায় চায়ের দোকানে বিক্রী করেন। কিষ্ট সাউও চা কেনে ওঁর কাছ থেকে। সামান্য বন্দকী কারবারও করেন—সেটা আমার কাছে অত্যন্ত খারাপ ঠেকে। কিন্তু জানি না, অনিবাবুর কিছু নিজস্ব স্বপক্ষ-সমর্থনের কারণ নিশ্চয়ই আছে। তাঁর বেঁচে থাকার জন্যে, স্বাবলম্বনের জন্যে হয়তো এ অন্যায়টাকে উনি অন্যায় বলে মনে করেন না। সারাজীবন উনি অন্যায় সহ্য করেছেন, চোখের সামনে নানারকম অন্যায় দেখে-ছেন, তাই বোধহয় তাঁর অন্যায় করতেও কোনো অপরাধ বোধ হয় না। এটাই নিয়ম বলে মেনে নিয়েছেন উনি এবং যারা ওঁর কাছে টাকা নেয়, হয়তো তারাও। ইচ্ছে করলে তিনি বেশ আয়াসে ভুবনেশ্বরে থাকতে পারতেন। অথচ থাকেন না। নিজে হাত পুড়িয়ে রান্না করে খান, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে অসহায় অবস্থায় দিন কাটান, অথচ তবু সেখানে যান না, থাকেন না। কি এক অজ্ঞাত অভিমানে এখানেই জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটাবেন বলে উনি যেন মনস্থ করেছেন।

চান করে গামছা গায়ে দিয়ে ঘরে গেলেন অনিবাবু। একটা নীলরঙা লুঙি পরে এলেন, উপরে হাতওয়ালা গেঞ্জি। ঘর থেকে আয়নাটা বের করে এনে সূর্যের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে আয়নাটা ধরে ডান হাতে বাঁশের কাঁকই দিয়ে চুল আঁচড়ালেন।

তারপর বললেন, একটু চা খান। চা করি।

বললাম, আপনি তো ভাত খাবেন এখন। চা থাক এখন।

উনি বললেন, আজ একাদশী। ভাত আর খাব না। এক মুঠো মুড়ি খাব। চায়ের সঙ্গেই খাওয়া যাবে। তারপর বললেন, বুঝলেন, হাত-পাগুলো এখন সব বিদ্রোহ করেছে। সবসময় মাজাটা টন্‌টন্ করে, হাড়ে-হাড়ে, গাঁটে-গাঁটে নলা-বাঁশের মত কট্‌কটি ওঠে। শরীর সুস্থ না থাকলে বেঁচে থাকার মানে নেই কোনো।

অনিবাবু চা করতে গেলেন। আমি ওখানেই ভ্যাগাবন্ডের মত বসে রইলাম।

তৈলার বাঁশের বেড়ার পাশে পাশে লাউ কুমড়োর মাচান, সিমের জাঙ্গলা। নীচে একটু তুলসীমঞ্চ। নানা লোকের নানারঙা লুঙি গামছা সব মেলা রয়েছে বেড়ার গায়ে। শ্যামলবাবুর রান্নাঘরে কে যেন ডাল সম্বার দিল। কাঁচা লঙ্কা আর কালোজিরের গন্ধের সঙ্গে ফুটন্ত ডালের গন্ধ মিশে গেল। একটা মৌ-টুশকি পাখি এসে লাউয়ের জাঙ্গলার মধ্যে মধ্যে উড়ে কিস্‌কিস্‌ করে শীষ দিতে লাগল। একটা বোলতা এল কোথা থেকে—বোঁ-ও-ও—বুঁই-ই-ই—করে আমার মাথার উপর উড়ে বেড়াতে লাগল. তারপর এক উড়ান্‌ দিয়ে গিয়ে ধাক্কা খেল বারান্দার বাঁশের খোঁটার গায়ে—ঠক্‌ক্‌ করে নীচে পড়ল। কিছুক্ষণ পড়ে থেকে, আবার বোঁ-ও-ও-ও—বুঁই-ই-ই—করে উড়ে গেল।

মাটিতে একটা বাদামী টাকা-কেন্নো বুকে হেঁটে হেঁটে কোথায় যাচ্ছিল। শ্যামলবাবুর কালো কুকুরের বাচ্চাটা ছায়া থেকে উঠে এসে ওর সামনে দু'থাবা রেখে দাঁড়াল। কুঁই কুঁই করে লেজ নাড়ল কিছুক্ষণ, তারপর অনেকক্ষণ পর সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে থাবা মারল টাকা-কেন্নোটাকে। সঙ্গে সঙ্গে কেন্নোটা গুটিয়ে গিয়ে গোল টাকার মত হয়ে গেল। বাচ্চাটা মজা পেল। ডাকল, ভুক্‌-ভুক্‌-ভুক্‌—ডেকেই, কোমর দুলিয়ে লেজ নাড়তে লাগল উত্তেজনায়।

তৈলার উপরে হাওয়া বইছিল। ফসলগুলোর মাথা দোলাদুলি করছিল। বাঁশের খোঁটার উপর কাকতাড়ুয়া হাওয়ায় দুলছিল। বগারীর ঝাঁক মেঘের মত উড়ে আসছিল তৈলায় নামার জন্যে। ঝুপরীর মধ্যে বসে-থাকা নীল শাড়ি পরা একটা মেয়ে হাতে ক্যানেস্তারা বাজাতে বাজাতে মুখে নানারকম বিচিত্র শব্দ করে ওদের তাড়াচ্ছিল। গোয়াল থেকে দেশী গাই ডেকে উঠল হাম্বা-অ্বা-অ্বা করে। বাতাসে খড়ের গন্ধ, জঙ্গলের গন্ধ, কুকুরের বাচ্চার গায়ের গন্ধ। রান্নাঘরের সম্বার দেওয়া ডালের গন্ধ, সব মাখামাখি হয়ে গেল। হাওয়ায় শুক্‌নো বাঁশ পাতা ওড়াউড়ি করছিল, সেগুলো হঠাৎ ঘূর্ণীর্তে পাক্‌ খেয়ে খেয়ে উপরে উঠতে লাগল। লজ্জাবতী লতার ফিকে বেগ্‌নে রঙা ফুলগুলো সেই হঠাৎ-হাওয়ায় ভীষণভাবে দোলাদুলি করে উঠল।

অনিবাবু হঠাৎ আমার সেই ঘোর কাটিয়ে বললেন, নিন, চা ধরুন।

চা খেতে খেতে অনেক পুরনো গল্প হল।

একসময় অনিবাবুকে বললাম, কেন এখানে পড়ে আছেন এমন করে, দ্বিতীয়-বার অ্যাটাক হলে কি হবে? অঙ্গুলে পৌঁছতে পৌঁছতেই তো বেলা যাবে। এখানে কি সেরকম হাসপাতাল আছে. না তেমন কোনো চিকিৎসা হবার সম্ভাবনা আছে?

অনিবাবু তৈলার দিকে চেয়ে অদ্ভুত উদাসীন হাসি হাসলেন।

বললেন, ঋজুবাবু, যার পয়সা নেই, যার খাতির-প্রতিপত্তি নেই, তার জঙ্গলই ভালো। এখানে মরলে দোষটা নির্বিঘ্নে জঙ্গলের ঘাড়ে চাপানো যাবে, কিন্তু শহরে মরলে দোষটা কার ঘাড়ে চাপবে? জঙ্গলই ভালো।

আমি বললাম, আপনার স্ত্রী, আপনার মেয়ে রাগ করেন না আপনার উপর?

অনিবাবুর ভুরু কুঁচকে উঠল।

বললেন, আমি হচ্ছি গিয়ে দা গ্রেট জমিন্দার অব্ বরিশাল। বুজু গুহ-ঠাকুরতার একমাত্র ব্যাটা, দা গ্রেট অনি গুহঠাকুরতা। সেই আমার উপর রাগ করবে কেডা? আমার কি আত্মসম্মান নেই যে, মেয়ের রোজগারে ঘরে বসে খাব আমি? তার চেয়ে এখানে না-খেয়ে শুকিয়ে মরব, তাও ভি আচ্ছা।

আমি একটু থেমে আলোচনাটা লঘু করার চেষ্টা করে বললাম, এটা অভিমানের কথা হল। আপনার সঙ্গে কি কেউ খারাপ ব্যবহার করেছে যে, আপনি ওদের বিনা কারণে দোষী করছেন?

আমি খুব অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা করে ফেললাম যে, তা পরক্ষণেই বুঝতে পেলাম।

উনি বললেন, দেখুন, আমি কোনো শালার খারাপ ব্যবহারের তোয়াক্কা করি না। তবে কথাটা কি জানেন, খারাপ ব্যবহার করলেও না হয় বুঝতাম। আমার সঙ্গে কেউ যে কোনোরকম ব্যবহারই করে না। আমি একেবারে অব্যবহার্য হয়ে গেছি। বুঝলেন, ভালো-মন্দ, সবরকম ব্যবহারেরই অযোগ্য।

তারপর একটু থেমে বললেন, জানেন, বাবার জমিদারী সেরেস্তায় একজন বুড়ো মুহুরী ছিল। হারাণ মুহুরী। অথর্ব হয়ে পড়েছিল। সে সেরেস্তা ঘরের এক কোণায় একটা তেলচিটে চৌকিতে শুয়ে-বসে থাকত, খক্ খক্ করে কাশত, অবিরাম ছাগল-নাদির মত দেখতে চ্যবনপ্রাশ খেত। ও লোকটা যে একটা মানুষ, সেটা কেউই আর স্বীকার করত না। ও যেন ওপারের স্টীমার ধরার জন্যে স্টীমার-ঘাটায় বসে থাকত—বসে থাকত তো বসেই থাকত। ওর যেন আর কিছুই করার ছিলো না। আমরা যেতাম আসতাম ওর সামনে দিয়ে, কিন্তু কখনও তাকে তক্তপোষের উপর তাকিয়ার মতই কোনো জড় পদার্থ ছাড়া অন্য কিছু ভাবিনি। বাড়ির মেয়েরা যখন বজরায় করে বেড়াতে যেতেন তখন ঐ হারাণ মুহুরীকে বাবা সঙ্গে পাঠাতেন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, হারাণ মুহুরীর সামনে কাকীমা-পিসীমারা কাপড় ছাড়তেন—নানারকম মেয়েলি গল্প করতেন—সে যে একজন মানুষ, পুরুষমানুষ, সে যে এখনও বেঁচে আছে, একথা কেউ কখনও মনেই আনতেন না। একটা অপ্রয়োজনীয় ক্ষমতাহীন পোষা কৃপানির্ভর

জানোয়ারের মত তার জীবন ছিল।

অনিবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, বুঝলেন ঋজুবাবু, ওখানে থাকলে আমায় হারাণ মুহুরীর মতই বাঁচতে হত। রোজগারে মেয়ে আমার, রোজগার করে আমাকে খাওয়াবে-পরাবে। আমি সেখানে থাকলে তার স্বাধীনতা খর্ব হবে। তার ছেলে-বন্ধুরা অবাধে যাওয়া-আসা করতে পারবে না। তার মা উঠতে-বসতে খোঁটা দেবে। যে রিটায়ার্ড লোকের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নেই, যার কাছে কারোই আর কিছু পাওয়ার নেই, তাকে কেউই চায় না। তার স্থান নেই সংসারে।

আমি বললাম, আপনি হয়তো আপনার স্ত্রী ও মেয়েকে ভুল বুঝেছেন। আপনি হয়তো তাঁদের প্রতি অন্যায় করছেন।

অন্যায় করছি? বলেই, অনিবাবু একবার ফ্যাকাশে আশাহীন চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন।

তারপর বললেন, আমি কারো প্রতিই অন্যায় করিনি। যদি কোনো অন্যায় করে থাকি তো চিরদিন, গোড়া থেকেই নিজের উপরেই করেছি। যে প্রথম থেকে শুধু নিজের প্রতিই অবিচার করে, সে বড় নরম চরিত্রের লোক; তাকে সকলেই পেয়ে বসে। তাকে কেউ ক্ষমা করে না। এ কথাটা মনে রাখবেন ঋজুবাবু। আপনার বয়স আমার হাঁটুর সমান। এ কথাটা মনে রাখবেন সব-সময়। সারাজীবন।

তারপর চায়ের গেলাসে বড় চুমুক দিয়ে, চুপচাপ একটুক্ষণ বসে থেকেই অনিবাবু বললেন, জংগলী লোক আমি। শহরের কেতাকায়দা জানি না। কি বলতে কি বলে ফেলি. খালি গায়ে লুঙি পরে লোকের সামনে বেরিয়ে পড়ি; রাগ হলে লোককে হারামজাদা বলে গাল পাড়ি। জংলী লোকের এই খোলামেলা জংগলই ভালো। ভুবনেশ্বরের অন্ধকার-অন্ধকার. চিপু-চিপু ঘরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। থাকতে পারি না সেখানে।

এই অবধি বলেই, অনিবাবু হঠাৎ উঠে পড়লেন।

আমার দিকে পিছন ফিরে দাওয়ার মধ্যে গিয়ে তৈলার দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন।

একজন লোক ক্ষেতে কাজ করছিল, তাকে চেঁচিয়ে বললেন, এই শালা! কত-বার বললাম তোকে যে, নালার দিকের বেড়াটা মেরামত কর, মেরামত কর। রাতে যখন আবার শুয়োর ঢুকবে, তখন কি তুই আঙুল চুষবি?

তারপর অনিবাবু অনেকক্ষণ আমার দিকে মুখ ফেরালেন না।

যখন আবার আমার কাছে এসে বসলেন দেখলাম, তাঁর কুঁচকে যাওয়া অথচ রক্তশূন্য ফোলা ফোলা চোখের কোল দুটো ভিজে।

আমি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। খারাপ লাগছিল আমার।

এমন সময় লাল মাটিতে কির্ কির্ শব্দ তুলে সাইকেলটা চালিয়ে রেঞ্জার সাহেব এসে থামলেন শ্যামলবাবুর তৈলার কাছে।

সাইকেল থেকে নেমে, সাইকেলটা বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে ভিতরে এলেন। খাকী শোলার টুপীটা খুললেন। তারপর নমস্কার বিনিময়ের পর মাচায় বসে বললেন, বাইসনটাকে ডি. এফ ও. সাহেব 'রোগ' ডিক্লেয়ার করেছেন। আজই সকালে খবর পাঠিয়েছেন আপনাকে খবর দিতে। যত তাড়াতাড়ি হয় এটাকে মারার চেষ্টা করুন ঋজুবাবু। অনেক ঠিকাদারের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে এর জন্যে। বেজায়গায়-লাগা গাদা বন্দুকের গুলি আর টাঙ্গীর ঘা খেয়ে ওর মেজাজ এমন তিরিক্ষী হয়ে আছে যে, ও সাক্ষাৎ যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ থেকেই লেগে পড়ুন। এর একটা হিল্লে করুন।

অনিবাবুও বললেন, হ্যাঁ। এই সৎ কাজটা করুন তো। তবে ব্যাটা যে কখন কোথায় থাকে তার হদিশ করাই মুশকিল। আজ আর সময় নেই। কাল একেবারে ভোর-ভোর বেরিয়ে পড়ুন সারাদিনের জন্যে।

রেঞ্জার সাহেব বললেন, আপনাদের ডেরার পিছনের জঙ্গলে কালকেও দেখা গেছে তাকে। ঐ পিছনের জঙ্গলে দশ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ও আপাতত আছে। তবে এ তো আর পোষা কুকুর নয় যে চেন দিয়ে বাঁধা থাকবে এক জায়-গায়। আপনি এক মাইল হেঁটেই দেখা পেতে পারেন তার, আবার সারাদিন ঘুরেও নাও পেতে পারেন।

আমি বললাম, চিনব কি করে? যদি ভুল করে দলছাড়া অন্য কোনো বাইসনকে মেরে দিই।

রেঞ্জার সাহেব হাসলেন। বললেন, কোনো ভয় নেই, তার ধারেকাছে গেলেই সেই-ই আপনাকে চিনিয়ে দেবে—একেবারে আইডেনটিটি কার্ড সঙ্গে নিয়ে সেলাম জানাবে এসে। তবে শুনে রাখুন যে, সে প্রকাণ্ড বাইসন। আগে ঐ টুম্বকার দিকে থাকত। বলে হাত দিয়ে ওদিকে দেখালেন।

আমি সোজা হয়ে বসে বললাম, সেই বিরাট বাদামীরঙা বাইসনটা? ওকে তো বহুবার দেখেছি আমি, কখনও তো আক্রমণ করেনি?

রেঞ্জার সাহেব বললেন, অঙ্গুল থেকে এক চোরা শিকারীর দল এসেছিল রাতে। ফরেস্ট গার্ডকে পানমৌরী খাইয়ে বে-সামাল করে দিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছিল। চারটে সম্বরকে আহত করেছিল, একটাকে নিয়ে গেছিল। আর রাস্তার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে-থাকা বাইসনটার গায়ে বুলেট মেরে দিয়ে চলে গেছিল। স্রেফ খুশীর জন্যে। নেশার ঘোরে। গুলীটা পেটে লেগেছিল। তাতে বেচারা যন্ত্রণায়

কাতরাচ্ছে কিন্তু মরার এখনও অনেক দেরী।

শুনে খুব খারাপ লাগল। যারা জঙ্গলকে ভালোবাসে না, জঙ্গলকে জানে না, জানতে চায় না; যাদের কোনো দরদ নেই জংলী জানোয়ারদের প্রতি, তারা কেন যে জঙ্গলে আসে, জানি না।

একটু পরে রেঞ্জার সাহেব উঠলেন।

বললেন, আমি তাহলে ডি. এফ. ও. সাহেবকে খবর পাঠাচ্ছি যে, আপনি রাজী হয়েছেন। অন্য কাউকে তাহলে এর জন্যে ডাকা হবে না।

আমি মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালাম।

উনি বললেন, চলি এখন।

বলেই, বাইরে গিয়ে সাইকেলে উঠে চলে গেলেন।

বেলাও অনেক হল। শ্যামলবাবু কখন ফিরবেন ঠিক নেই। অনিবাবুকে বললাম, তাহলে আমিও উঠি অনিবাবু।

অনিবাবু বললেন. সেদিন টিকরপাড়ায় মাছ পাইনি। মাছ যদি পাই তো খাওয়াবো আপনাকে।

উঠতে উঠতে আবার বললাম, অনিবাবু, আপনি বড় অভিমানী। আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, কিন্তু একটা কথা বলতে পারি; অভিমানের দাম দেয় না কেউই। পৃথিবীতে কারো অভিমানেরই কেউ দাম দেয় না। পৃথিবীটা একটা মুদীর দোকান। এখানে এক হাতে দিতে হয়, অন্য হাতে নিতে হয়। দেনা-পাওনাটাই সব। অভিমানের কোনোই কদর নেই।

অনিবাবুর চোয়াল শক্ত হয়ে এল।

বললেন. আমি তা মানি না ঋজুবাবু। এই যে কুকুরের বাচ্চাটা দেখছেন, এ শালার কোনোরকম অভিমান নেই। আমি এটাকে দু'বেলা লাথি মারি, তবুও শালা আমার খাওয়ার সময় আমারই হাতের একমুঠো ভাতের জন্যে ঘুরঘুর করে। কিন্তু আমি যে মানুষ ঋজুবাবু। মানুষ মাত্রেরই অভিমান থাকে। থাকা উচিত। যে মানুষের মান-অভিমান জ্ঞান নেই, থাকে না, সে-শালা কুকুর। আমি তো কখনও কুকুর হতে চাইনি।

অনিবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আস্তে আস্তে আমি হেঁটে ফিরছিলাম ডেরার দিকে। শীতের দুপুরবেলা ঝক্‌ঝকে নীল আকাশে রোদ উড়ছিল। আমার মন উড়ছিল। কত-কী ভাবতে ভাবতে, মনে মনে, মনের তাঁতে অনেকরকম লাল নীল হলুদ সবুজ ভাবনার সুখ ও দুঃখের সুতো বসিয়ে শান্তিপুরী তাঁতীর মত তাঁত বুনতে বুনতে আমি একা একা জঙ্গলের পথে হেঁটে ডেরায় ফিরছিলাম।

বোষ্টম নালার কজওয়ের নীচ দিয়ে বকের গায়ের মত সাদা জল বয়ে চলে-

ছিল পাথরে পাথরে কল্‌কল্‌ করে। এ জায়গাটা আমার বড় ভালো লাগে। ঐপাশে মাছ ধরার বাঁশের বেড়া। সেই একলা বন্ধন গাছটা—এক কোমর জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে—। সাদা বালির চর, কালো কালো শিকড় বালির উপর রয়েছে।

কজওয়ের পাশে গাছতলায় একটুক্ষণ বসলাম। তোমার সেই ছবিটা বের করলাম বুক-পকেট থেকে। তুমি! তুমি! সেই কালো ব্লাউজ আর কালোপাড়ের শাড়ি। তুমি চেয়ে আছ—মিষ্টি দৃষ্টি চোখে। চেয়ে আছ।

নয়না, জানো, আমিও অনিবাবুর মত অভিমানী। আমিও একজন মানুষ। আমি যে কুকুর হতে চাইনি কখনও। তোমার কারণেও কুকুর হতে চাইনি; পারিও নি। মানুষ হয়ে, মানুষ থেকে, সম্মানের সঙ্গে একজন মানসী মানুষীকে চেয়েছিলাম। আজ আমার মত করে কেউই হয়ত জানে না যে, জীবনে যা কিছু চাওয়া যায় তার অনেক কিছুই পাওয়া যায় না। অথচ তবুও বেঁচে থাকতে হয়, কাজ করতে হয়; কর্তব্যের বোঝা মাথায় নিয়ে হাঁটতে হয়। তবুও নিজের ইচ্ছায় থামা যায় না। অন্যর ইচ্ছা-নির্ভর হয়ে আমরা জন্মাই, মরবার সময়ও নিজের ইচ্ছায় মরা যায় না। কী আশ্চর্য পরনির্ভর আমাদের জীবন!

॥ ৭ ॥

পূবের আকাশে সবে আলো ফুটেছিল।

ডেরায় কাবাড়িদের মধ্যেও তখনও ওঠেনি সকলে। রাতের আগুন তখনও জ্বলছিল ধিকি ধিকি। পোড়া কাঠ, কাঠের ছাই, আগুনের সাদাটে আভা তখনও দেখা যাচ্ছিল।

গগন ইতিমধ্যেই উঠে একটা গামছায়, মাটির হাঁড়িতে চাল বেঁধে নিয়েছিল। দুপুরের মধ্যে না ফিরতে পারলে জঙ্গলেই কোথাও খেয়ে নেবো দুজনে।

ফোর-ফিফ্‌টি ফোর হাণ্ড্রেড ডাবল্-ব্যারেল রাইফেলটা নিয়েছিলাম। বাইসন মারার পক্ষে এটাই উপযুক্ত রাইফেল। তাঁবু থেকে বেরিয়ে ডেরার সামনে এসেই মনে হল, কত মাইল হাঁটার পর যে বাইসনের সঙ্গে দেখা হবে তার কোনোই স্থিরতা নেই, তাই এই দশ-পাউন্ড ওজনের রাইফেলটা মাইলের পর মাইল বয়ে বেড়ানো খুবই কষ্টকর হবে। তাই তাঁবুতে ফিরে ঐ রাইফেলটা রেখে দিয়ে, হাল্‌কা থ্রি-সিক্‌স্‌টি-সিকস্ রাইফেলটা নিয়ে এলাম। এটা আমার বাবা আমাকে দিয়েছিলেন। চোদ্দ বছর বয়স থেকে এটাকে হাতে নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছি। তাই একেবারে হাতে-বসা ছিল।

আমরা নালাটা পেরিয়ে তাঁবুর পিছনের জঙ্গলে ঢুকে গেলাম।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গগন একটা জানোয়ার-চলা গেম ট্র্যাক-এ এসে পড়ল। আমি আগে যেতে লাগলাম। বেশ ধীরে সুস্থে, চারদিকে ভালো করে নজর করতে করতে। গগনের চোখ নীচের দিকে। কোথাও বাইসনের পায়ের ভাঙ বা খুরের দাগ দেখতে পাওয়া যায় কি না তাই দেখতে দেখতে যাচ্ছে ও।

কিছুদূর গিয়েই অনেকগুলো বাইসনের খুরের দাগ পাওয়া গেল—পাকদন্ডীতে এবং একটা দশ হাত চওড়া ছোট্ট শুক্‌নো নালাতেও। কিন্তু ওগুলো কোনো দলের পায়ের চিহ্ন। বোধহয় এ দলটাকেই আমি আর শ্যামলবাবু যেদিন তৈলায় বসেছিলাম রাতে, সেদিন তৈলার পাশে দেখেছিলাম।

গগন নীচু গলায় স্বগতোক্তি করল; বলল, তোদের খুঁজছি না আমরা। গদাধরের খুনীকে খুঁজছি।

কিছুদূর গিয়েই পাকদন্ডীটা চড়াইয়ে উঠতে লাগল। চড়াইটা শেষ হবার

পর আমরা একটা পাহাড়ের চুড়োয় এসে উঠলাম। পাহাড়ের এ পিঠটায় হরজাই জঙ্গল ছিল। চুড়োয় উঠেই চোখ জুড়িয়ে গেল। গগন যে গগন, জঙ্গল যার চোখে স্রেফ জঙ্গলই শুধু, "সাউন্ড" আর "আনসাউন্ড" কাঠের জঙ্গল—জঙ্গলের মানে যার কাছে লক্ষ লক্ষ বর্গফুট দামী কাঠ ছাড়া অন্য কিছুই নয়, সেই গগনও মন্ত্র-মুগ্ধ হয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

সামনেই পাহাড়ের পিঠটা কচ্ছপের পিঠের মত ঢালু হয়ে নেমে গেছে। এদিকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সেগুনের প্ল্যানটেশান্ করেছেন। গাছগুলো বছর দশেকের হবে। খুব বড় হয়নি। আগাগোড়া কয়েক মাইল শুধু একই মাপের সেগুন। সেগুনের ফিকে জলপাই-সবুজ বড় বড় পাতাগুলোতে রাতের শিশির পড়েছিল। পূবে সূর্যটা অন্য একটা পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে সবে মুখ তুলেছে। সেই শিশির-ভেজা সেগুন বনের উপর প্রথম সূর্যের আলো পড়ায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হীরে ঝল্মল্ করছে। সেই মাইলের পর মাইল বিস্তৃত ঢালু পাহাড়ের গায়ের সেগুনের পাতার উপরের কোটি কোটি শিশিরবিন্দু থেকে কতরকম যে রঙ, কতরকম যে দ্যুতি ফুটে বেরুচ্ছে তা কি বলব!

যেই আমরা চুড়ো ছেড়ে ঢালুতে নেমে এলাম, অমনি সেই অমরাবতী হারিয়ে গেল। এখন মাথার উপরে চন্দ্রাতপ। নীচে শিশির-ভেজা আগাছা ও ঘাসে-ভরা বনের পাকদন্ডী।

সকাল দশটা নাগাদ আমরা প্রথম গুন্ডা বাইসনটার পায়ের দাগ পেলাম। এক জায়গায় ও রাতে বসেছিল, সেখানে লোম পড়ে আছে, রক্তও আছে কিছুটা—তবে সামান্য। থক্থকে কালো রক্ত। জায়গাটার নরম ঘাসগুলো এখনও শুয়ে আছে—তার উপরে শিশির পড়েছে। তার মানে, রাত থাকতেই সে এ জায়গা ছেড়ে চলে গেছে।

গগন নিরীক্ষণ করে বলল, বাইসনটা এখন আস্তে আস্তে হাঁটছে যদিও, তবুও কম করে তিন-চার ঘণ্টা আগে ও এ জায়গা ছেড়েছে। নিশ্চয়ই এতক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে। ওর পায়ে পায়ে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

এবার গগন আগে আগে চলল। ভাঞ্জ্ দেখে দেখে ও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে লাগল মাটিতে চোখ রেখে নেকড়ের মত। আমি ওর পায়ে পায়ে চলতে লাগলাম। বেশ জোরেই যাচ্ছিলাম আমরা। জার্কিনের নীচে ঐ শীতের মধ্যেও শিরদাঁড়া বেয়ে শির্শির্ করে ঘাম গড়াতে লাগল। অনেক নালা, টিলা, অনেক শালের, সেগুনের ও বাঁশের জঙ্গল পেরিয়ে এলাম আমরা।

এ পর্যন্ত আসতে আসতে একটি কুট্রা, একটি খুরাণ্টি এবং দুটি নীল গাইয়ের সঙ্গে দেখা হল, কিন্তু আমরা যাকে খুঁজছি তার সঙ্গে দেখা হল না।

সাড়ে-দশটা অবধি একটানা চললাম। ততক্ষণে প্রখর রোদ উঠে গেছিল। অনেকক্ষণ ধরে উঁচু নীচু পথে হাঁটার দরুন আমরা দু'জনেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

গগন নীচু গলায় বলল, প্রায় ধরে ফেলেছি, এখন পায়ের দাগগুলো একেবারে টাটকা। এক ফোঁটা রক্ত যে দেখা গেল একটু আগে, সেটাও টাটকা রক্ত। এবার একটা হেস্তনেস্ত হবে। তারপর গগন একটু হেসে বলল, আমি কিন্তু বাবু, বিপদ দেখলে গাছে উঠব।

আমি বললাম, সেকথা তোকে আমিও বলতে যাচ্ছিলাম। এ তো ছেলেখেলা নয়—আহত গুণ্ডা বাইসন, ইতিমধ্যে ও মানুষও মেরেছে—তাই তুই কোনোরকম বাহাদুরী না করে, তাকে দেখা গেলেই বা তার আওয়াজ শোনা গেলেই সোজা গাছে চড়ে যাবি। বুঝলে, গগনবাবু?

গগন হাসল। বলল, আচ্ছা।

ওখান থেকে একটু এগিয়েই আমরা দু'জনেই অবাক হয়ে গেলাম। খুরের দাগ থেকে দেখা গেল, বাইসনটা যেদিকে যাচ্ছিল, সেদিকে না গিয়ে একেবারে অ্যাবাউট টার্ণ করে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই ফিরে গেছে আবার প্রায় সোজাসুজি। সমান্তরাল রাস্তায়। তবে যাওয়া ও আসার পথের মাঝে একশো গজ মত তফাত আছে।

আমরা দু'জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

আবার আমি আগে আগে গেলাম। গগনের গায়ে হাত দিয়ে কানে কান লাগিয়ে আবার ওকে বললাম যে, বিপদ দেখলেই ও যেন গাছে ওঠে।

গগন কথা না বলে নিঃশব্দে মাথা নোয়ালো।

আমরা উল্টোদিকে আবও প্রায় একঘণ্টা এলাম। বাইসনটা যে সরলরেখায় আসছিল, সেই পথ ছেড়ে আবারও হঠাৎ বাঁয়ে ঢুকে গেছে। ওদিকে প্রায় আধমাইলখানেক দূরে একটা খুব উঁচু দেওয়ালের মত পাহাড়।—একেবারে খাড়া। তার নীচে বোষ্টমনালার গায়ের খোয়াই-এ ঘন গভীর আগাছা ও বাঁশের জঙ্গল। জঙ্গল এত গভীর যে, এক হাত ভিতরে কি আছে তা দেখা যায় না। এই মধ্যাহ্নেও জায়গাটা রীতিমত ছায়াচ্ছন্ন; ভেজা-ভেজা, গা-ছম্‌ছম্‌। পাথরে-পাথরে নানা রকম শ্যাওলা। ঢেঁকির শাকের মত ফার্ণ ও একরকম হলুদ ফুলের অর্কিড জন্মেছে। কুটুর কুটুর করে কুটুরে ব্যাঙ ডাকছে পাথরের আড়াল থেকে। ঝিঁঝি ডাকছে অবিরাম।

বাইসনটা এর ভিতরে ঢুকেছে। হয়ত দুপুরে বিশ্রাম নেবার জন্যে। জায়গাটায় কোনোরকম বিঘ্ন হবার কথা নয়।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম, প্রায় বারোটা বাজে।

এ জায়গাটা আমাদের ডেরা থেকে বড় জোর মাইল দুয়েক—কাক-উড়ানে। পুরো অসমান পথটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেছে—তাই ফিরে যেতে সময় লাগবে অনেক। ডেরায় ফেরার প্রশ্ন নেই এখন, কিন্তু সামনের নালার গভীরে ঢুকে পড়লে আর ফেরাও নেই। ওখানে পৌঁছনোর পর মুখ ফিরালেই বিপদ। বাইসনের সঙ্গে মোলাকাৎ করার পরই শুধু ফেরা যাবে। ফেরার কথা ভাবা যাবে।

গগনকে বললাম, গগন, শীগ্‌গীর আগুন কর। একটু খেয়ে নি। তারপর তুই এখানেই কোনো গাছে বসে থাকিস; আমি একা ঢুকব। ওখানে ঢুকলে কতক্ষণে বেরোতে পারব ঠিক নেই।

গগন কথাটাতে খুশী হল। বলল, আমারও ভীষণ খিদে লেগেছে বাবু। সকালে কিছু খাইনি।

মুহূর্তের মধ্যে একটা পরিষ্কার জায়গা দেখে, একটি তিরতিরানো ঝর্ণার পাশের পাথরের উপর দু'তিনটে ছোট পাথর বসিয়ে উনুনের মত করে নিয়ে গগন আমাদের খিচুড়ি চাপালো। শালপাতার দোনা করে জল এনে পাথরের একটা পাশ ধুয়ে নিল। ছোট-ছোট কাঠকুটো এনে এবং ওর সঙ্গে করে নিয়ে আসা দু'খণ্ড শুকনো সহজ-দাহ্য কাঠ সাজিয়ে নিয়ে আগুন জ্বালল। ফুঁ দিয়ে ফুঁ দিয়ে আগুনটাকে জোর করে দিল।

পাথরের উপর টান-টান হয়ে শুয়ে পড়লাম আমি।

নীচে নিরবচ্ছিন্ন অবিচ্ছেদ্য আন্ডারগ্রোথ। আর চারধারে বড় বড় গাছ। এরকম কোনো বড় গাছের নীচে এলেই বার বার তোমার কথা মনে পড়ে আমার। কিন্তু তুমি আমাকে ছায়া দাওনি। প্রখর রোদের মধ্যেই হাঁটিয়েছ শুধু। বছরের পর বছর।

টুপীটা মুখের উপর রেখে, রাইফেলটা পাশে রেখে আমি শুয়ে পড়লাম। দশ-পনেরো মিনিট শুয়ে থাকার পরই খিচুড়ির বগ্‌বগ্ আওয়াজ শোনা গেল হাঁড়িতে। গগন আমায় ডাকল। তারপর শালপাতা ছিঁড়ে এনে পাথরটার উপর বিছিয়ে রাখল। একপাশে একটু সন্ধব নুনের গুঁড়ো। খিচুড়ির হাঁড়িটা পাশে রেখে একটা চ্যাপ্টা কাঠের টুকরো দিয়ে চামচের কাজ চালিয়ে খিচুড়ি ঢেলে দিল। আমরা দু'পাশে বসে একই সঙ্গে খেলাম।

খাওয়ার পর গগন ওর হাঁড়িটা ধুতে গেল নালাটাতে। হাঁড়ি করে জল ভরে আনবে ও—জল খাব তখন। পাইপটাকে ধরিয়ে আমি ইজিচেয়ারে শোওয়ার মত করে পাথরটার উপর হেলান দিয়ে শুয়েছি, এমন সময় হঠাৎ

একেবারে অতর্কিতে সামনের বাঁ দিকের জঙ্গলে একটা আলোড়নের শব্দ শুনলাম। শব্দটা এত কাছে ও এত দ্রুত হল যে, কিছু বোঝার আগেই লাফিয়ে উঠতে উঠতেই দেখলাম যে, বাইসনটা প্রচণ্ড বেগে আমার দিকে ধেয়ে আসছে। আমি উঠে দু'পায়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই ও প্রায় পনেরো হাতের মধ্যে পৌঁছে গেল। সেই মুহূর্তে বড় রাইফেলটা রেখে আসার জন্যে আমি নিজেকে অভিসম্পাত দিলাম। সময় ছিল না বেশী, রাইফেলটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে সেফ্‌টি ক্যাচ সামনে টেনে ওটাকে শুটিং পজিশানে আনতে আনতেই বাইসনটা খয়েরী রঙা একটা মালগাড়ির ওয়াগনের মত আমার উপর এসে পড়ল বিদ্যুৎগতিতে। আমি গুলি করলাম, আমার মনে আছে, গুলি করলাম, তার পরমুহূর্তেই বাইসনটার মাথাটাকে আমার পেটের কাছে দেখলাম। একেবারে কাছে।

শূন্যে উঠে গেলাম। সোজা শূন্যে উঠে গেলাম—অনেক—অনেকখানি উৎক্ষিপ্ত হয়ে গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে আমি সূর্যকে দেখতে পেলাম, নীল ঝক্‌ঝকে আকাশ দেখতে পেলাম একঝলক, তারপর শূন্যেই ডিগ্‌বাজী খেয়ে নীচে পড়লাম। কখন যে জোর ব্যথা লেগেছিল আমার মনে নেই। যখন বাইসনটা তার মাথায় করে আমাকে আকাশে ছুঁড়ে দিল তখনই, না যখন নীচে পড়লাম তখন, তা জানি না। নীচে পড়লাম। তারপরে আমার আর কিছু মনে নেই। অর্কিডের লক্ষ লক্ষ হলুদ ফুল ফুটে উঠল আমার চোখের সামনে, আমার চেতনার আলোকিত চবুতরায় অনেক আলো জ্বলে উঠল। তারপরেই হঠাৎ...। অন্ধকার, চাপ চাপ গাঢ় অন্ধকার, বোবা অন্ধকার। চারিদিকে। এখন কী আরাম। কী আরামের ঘুম!

দূর থেকে তোমার বাড়ির আলোটা দেখা যাচ্ছিল। ঝাঁকড়া গাছ দুটোর ফাঁকে ফাঁকে তোমার ঘরের আলোর ফালি পথে এসে পড়েছিল। আমি অন্ধকারের মধ্যে পতঙ্গের মত নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে, জ্বালার দিকে; তোমার ঘরের আলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

তোমার বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছেছি, সেই বাড়ির দরজায় আমার ভালোলাগার পা রাখব আমি; এমন সময় ঝুপ করে অন্ধকার হয়ে গেল। লোডশেডিং হয়ে গেল।

তোমার দরজা খোলা ছিল। আমি অন্ধকারে দরজা ঠেলে ঢুকলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। কোথাও আলো দেখা যাচ্ছিল না। কোথাও আলোর

আভাসমাত্র ছিল না।

অন্ধকারে পথ হারিয়ে শিশু যেমন মাকে খোঁজে, তার আশ্রয়কে খোঁজে, আমি তেমনি করে বললাম, নয়না, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না; তুমি কোথায়? তুমি কোথায়?

চাপ-চাপ অন্ধকারে আমার প্রশ্ন হারিয়ে গেল। উত্তর পেলাম না কোনো।

অনেকক্ষণ পর, যেন অনেক যুগ পর, দূর থেকে, বহুদূর থেকে তোমার শান্ত সুন্দর গলা শুনলাম। তুমি বললে, আমি ছাদে আছি। ছাদে আসুন।

তোমার গলার স্বর আমার বুকের মধ্যে ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের মত চাবি টিপে-টিপে আমার সমস্ত বোধ, আমার সমস্ত চেতনাকে যোগ করল। যোগ করে নেবার পর, যোগফলের সঙ্গে আমার আনন্দ দিয়ে তাকে গুণ করল। তারপর সেই বহু-গুণান্বিত সংখ্যাগুলো টুক্‌রো টুক্‌রো আনন্দের বোধ হয়ে আমার মনের আকাশময় ছড়িয়ে গেল।

আমি হাতড়ে হাতড়ে আস্তে আস্তে তোমার দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম। কতক্ষণ সিঁড়ি বেয়ে উঠেছিলাম, মনে নেই। অনেকক্ষণ পর ছাদে পেঁছিলাম আমি। তোমার কাছে।

তুমি উঠে এলে না। আমাকে দেখে তুমি যে খুশী হয়েছ, এমন কোনো লক্ষণ দেখালে না। তবুও আমি অন্ধকারের মধ্যে তোমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

প্রায় তোমার কাছে পেঁছে গেছি, এমন সময় আমার পায়ে লেগে কি যেন একটা ঝন্‌ ঝন্‌ করে ভেঙে গেল।

আমি লজ্জিত হয়ে, বুঝতে না পেরে বললাম, আমি কি যেন ভাঙলাম!

তুমি উদাস নৈর্ব্যক্তিক গলায় বললে, আলো।

আমি বললাম, ঈস্‌-স্‌!

তুমি বললে, কিছু হবে না। এর দাম বেশী না।

আমি আবারও যন্ত্রচালিতের মত বললাম, ঈ-স্‌-স্‌!

তুমি আবারও বললে, দাম বেশী না।

আমি জানতাম যে, আলোর দাম তুমি কখনো জানোনি! যার জীবনে অন্ধকার নেই, ছিল না কখনও; সে আলোর কী যে দাম, তা জানবে কি করে?

আমি বললাম, না, তার জন্যে নয়।

তুমি বিরক্ত গলায় বললে, তবে কি জন্যে?

আমি বললাম, আমি শুধু অন্ধকারই ভাঙতে চেয়েছিলাম; আলো ভাঙতে চাইনি।

তুমি উত্তর দিলে না।

গা ধুয়ে তুমি ছাদে দাঁড়িয়েছিলে। তোমার গায়ের সাবানের গন্ধে ছাদ ভরে গিয়েছিল, সেই গন্ধের সঙ্গে বকুলফুলের গন্ধ মিশেছিল। সেই অন্ধকারে তোমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে, তোমার সুস্নাতা শরীরের গন্ধে আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল যে...।

তুমি অনেকক্ষণ কোনো কথা বললে না। তারপরেই তুমি হঠাৎ আক্রমণের গলায় বললে, আপনাকে নিয়ে আমি ফেড্-আপ্। আমি ফেড্-আপ হয়ে গেছি।

আমি অনেক কিছু বলতে পারতাম, কিন্তু ইচ্ছে হল না। একসঙ্গে এত কথা ভীড় করে এল যে গুছিয়ে বলতে পারা সম্ভব ছিল না। গলার কাছে অভিমানের দলা পাকিয়ে উঠল।

আমি বললাম, আমি যাচ্ছি।

তুমি বললে, বসবেন না?

তোমার গলায় আনন্দের রেশ লাগল। আমি এখুনি চলে গেলে তুমি যে সুখী হও, এ কথাটা বুঝতে পেরেছি জেনে তুমি খুশী হলে।

আমি আবার বললাম, যাচ্ছি।

তুমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, আচ্ছা।

আগে তুমি রোজ সিঁড়ির মুখ অবধি আসতে। আমি নেমে না-যাওয়া অবধি দাঁড়িয়ে থাকতে। আজ তুমি কিছুই করলে না। আমাকে তুমি ভেঙে-যাওয়া আলোর মতোই বাতিল করে দিলে।

আমি অন্ধকারের মধ্যে, অন্ধকারের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে, অন্ধকার পথে নেমে এলাম। নেমে এসেই, দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমি কোথায় যাবো? আমার যে আর কোথাওই যাবার ছিল না; নেই।

তোমার বাড়ি, তোমার মন ছাড়া অন্য কোথাওই তো যাইনি কখনও আমি! অন্য কোনো মনেই তো আমি যেতে চাইনি।

অনিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হঠাৎ।

উনি ইশারায় বললেন, যাবেন নাকি? আমি যাচ্ছি।

উনি চলতে লাগলেন।

বাইসনটা আমার থেকে একটু দূরে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

ওর সারা গায়ে রক্ত। আমার সারা গায়েও রক্ত।

আমি ওর উদ্দেশ্যে বললাম, যাবেন নাকি? আমরা চললাম।

বাইসনবাবু কি বললেন উত্তরে, এবং আদৌ কিছু বললেন কিনা তা শুনতে পেলাম না।

মনে হলো, তিনি আমাদের আগেই রওয়ানা দিয়েছেন।

আমি আর অনিবাবু হেঁটে চললাম।

আস্তে আস্তে।

আমাদের কোনো তাড়া ছিল না।

হলুদ অর্কিড আর সবুজ নরম ফার্ণ পায়ে মাড়িয়ে, গিলিরী শিয়ারী, মুতুরী লতার পাশ দিয়ে; লাল লাল থোকা-থোকা না-নউরিয়া ফুল-ফোটা ঝোপের মধ্যে মধ্যে আমরা হেঁটে চললাম। যেন ভারশূন্য ভাবে ভেসে চললাম।

অনিবাবু বললেন, জঙ্গলই ভালো, বুঝলেন ঋজুবাবু; খোলামেলা, নিঃশ্বাসের কষ্ট হয় না। কি বলেন?

উত্তরে আমি বোধহয় কিছু বলতে চাইলাম, কিন্তু.........।

আমরা পাশাপাশি হেঁটে চললাম।

যেন ভেসে চললাম--

কোনো অজানা অথচ আশ্চর্য এক অনাবিল দেশে।

—